জীবনের স্বাদ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বাণীশিল্প
১১৩/ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : মারগারেট ম্যালেট
সহায়তা করেছেন : প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশক :
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩/ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্তা প্রতিভা দত্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনের স্বাদ

তাকিয়ে দেখার মত দৃশ্য বটে। কালো কুচকুচে লম্বা ঠোঁট বাড়িয়ে কাকটা জোরে ঠোকর দেয়, মধু না, যেন পোকা খুঁটে খায়, ফলে গাছের ডালটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে একসঙ্গে তিনটে চারটে আস্ত শিমূল ফুল বা ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে।

ভারি মজার দৃশ্য।

হতচ্ছাড়া বেরসিক কাক। যেখানে রাতদিন নর্দমার ময়লা খোঁটে, ডাস্টবিন ঠোকরায়, তার কিনা ফুলের মধু খাবার শখ।

হরলাল এটা কিছুতেই বিশ্বাস করে না।

নিশ্চয়ই বেটা শিমূলের গর্ভকেশরে পোকা দেখতে পেয়ে এত জোরে এক একটা ঠোকর লাগাচ্ছে। কি সংঘাতিক ধারালো চোখা ঠোঁট। খড়্গের মতন। ঐ ঠোঁট দিয়ে মধু খাওয়া চলে!

মধু খায় শালিক বুলবুলি দোয়েল চন্দনা। যাদের ছোট ছোট ঠোঁট, হালকা পাখা, মিষ্টি আওয়াজ—গাছের ডাল নড়বে কি, ওদের ঠোকর খেয়ে ফুলগুলি রীতিমত হাসে। বারান্দায় মোড়া বিছিয়ে চুপচাপ বসে থেকে হরলাল কথাটা চিন্তা করে।

কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে কিছুতেই যেন প্রশ্নটার সদুত্তর পায় না সে। একটা হেঁয়ালির মতন থেকে যায়।

যারা বেরসিক তারা কবে গান ভালবাসে? ফুলের গন্ধ ফুলের মধু বা আকাশের তারা ঘাসের শিশির—বা মেঘলা আকাশের রামধনুর বাহার, উহুঁ—কাকের জন্য শকুনের জন্য শেয়ালের জন্য বাঁদরের জন্য নয় নিশ্চয়ই। তবে আর ঈশ্বর এত কুৎসিত করে ওদের সৃষ্টি করতেন না।

তাদের জন্য ভাগাড়ের মরা গরু মোষ, পচা ঘা, কাদার কিলবিলে পোকা, ময়লার দুর্গন্ধ রয়েছে। এসবও ঈশ্বরের সৃষ্টি। কাজেই—

এই পর্যন্ত এসে হরলালের চিন্তাটা থমকে দাঁড়ায়। কাকটা উড়ে গেছে। যাবার সময় গাছের ডালে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। আরও কিছু ফুল কিছু পাপড়ি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে।

চৈত্রের হাওয়া লেগে এক একটা পাপড়ি কেমন চরকির মতন ঘুরে ঘুরে পড়ছে। পড়ুক। এতক্ষণ পরে হরলালের হুঁশ হয় একটা গাছের দিকে এতটা সময় তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

বাড়ির ভিতর থেকে ঠকঠক আওয়াজ আসছে। কিসের আওয়াজ? হরলাল প্রথমটা বুঝতে পারে না। কান খাড়া করে রাখে।

আজকাল কি সে কানে কম শুনছে?

মোটেই না। তার কান ভয়ানক সজাগ। ষাটের কাছাকাছি এসে ছোট বড় মাঝারি সব রকম শব্দ সে শুনতে পায়। খুব ভালরকম শুনতে পায়।

তেমনি দৃষ্টি।

পরিষ্কার বুঝতে পারে, দু চার বছর আগেও তার চোখ এত খর ছিল না। যেন সাত হাত জলের নিচের জিনিসও সে দেখতে পায় এখন। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও মাটি থেকে ছুঁচটা আলপিনটা কুড়িয়ে নিতে পারে।

ছুঁচ আলপিনের মতন মানুষের মুখে সূক্ষ্ম সব রেখা জাগে না? সব সময় না। কোন কোন সময়।

কেবল কি চোখ।

ইদানিং হরলালের কানের জোরও ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। এক কথায়—যাকে বলে ধারাল শ্রবণেন্দ্রিয় তার এখন। খুব আস্তে কেউ কথা বললেও দূর থেকে সে বেশ শুনতে পায়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বলে দিতে পারে কোন দিকে কোন গাছের পাতা টুপ করে খসে পড়ল। কোথায় একটা ঘুন পোকা ঘস ঘস শব্দ করে একটা বাঁশ ছিদ্র করছে।

এটাও একটা অভিশাপ। এই বয়সে চোখের কানের তেজ বেড়ে যাওয়া। যে জন্য অনেক অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখতে হয়, অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়। তখন কার না মন খারাপ হয়?

কিন্তু এখন এই ঠকঠক আওয়াজ?

শোবার ঘর পার হয়ে হরলাল পিছনের দরজা দিয়ে ওধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক কালকের সময় এটা। গাছের আগার রোদ নিভে গেছে। এখনি রাস্তার কোণায় মিউনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্টের মাথার ডুমটা জ্বলে উঠবে। লোকের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে।

হুঁ, পাড়াপড়সী যারা আছে তাদের ঘরে। আশেপাশে যে ক'খানা দোকান আছে সেসব ঘরে। এবং দূরের অন্য সব বাড়িতে, রাস্তায়।

তা বলে নিজের হাতে হ্যারিকেনটা না জ্বাললে এই ঘর দোর অন্ধকার হয়েই থাকবে। ইলেক্ট্রিক নেই বাড়িটায়।

অমূল্য যে জেনেশুনে কেন এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছে হরলাল বুঝতে পারে না। অবশ্য ইলেক্ট্রিক থাকলেও সুইচ না টিপলে দুখানা ঘরই অন্ধকার হয়ে থাকত। সেই রাত দশটায় অমূল্য বাড়ি ফিরলে তবে যদি এই বাড়ির ঘর দুয়ার আলোর মুখ দেখত।

কিন্তু এই জিনিস হরলাল চায় না। খেটেখুটে ঘরে ফিরে অমূল্য সিঁড়ি বারান্দায় দরজায় চৌকাঠে চাপ চাপ অন্ধকার দেখবে, হোঁচট খাবে, এই কোণার পেরেকে পা লেগে তার পাজামা ছিঁড়বে, ওই কোণার ভাঙ্গা রেলিঙের শিকে হাত লেগে তার সার্ট ছিঁড়বে, কেবল কি সার্ট পাজামা ছেঁড়া, একদিন অন্ধকারে চলতে গিয়ে খোলা বঁটিতে পা লেগে তার পা কেটে গিয়েছিল না? কাটা পা নিয়ে কতদিন ভুগেছিল অমূল্য!

যে জন্য তারপর থেকে হরলাল প্রতিজ্ঞা করেছে। তোমার মন খারাপ থাকতে পারে। হতাশা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তুমি যত

খুশি ভুগতে পার। কিন্তু ছেলেমেয়েদের তুমি কষ্ট দিও না। ছেলেমেয়ে বলতে বিশেষ করে অমূল্যকেই বোঝে হরলাল। আর দুটি সম্পর্কে সে রাগ করবে কি খুশি থাকবে নিজেও বুঝতে পারে না।

সারাদিন খাটতে হয় অমূল্যকে। ঘরে ফিরে ঐ ছেলে একটু আরাম চায়, স্বস্তি চায়। বাড়ির লোকজনের কাছে এটা তার প্রাপ্য। খুব বেশি না যদিও। ঘরে আলো থাকবে। চৌবাচ্চায় একটু জল থাকবে। তার ওবেলার ভেজা লুঙ্গি গেঞ্জি ঘরে ফিরে সে শুকনো দেখবে। যাতে অফিসের জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে সেসব সে আবার ব্যবহার করতে পারে—অমূল্যর জামা কাপড়ের সংখ্যা কম।

আর তার দরকার দু মুঠো গরম ভাত—ভাত বা রুটি, রুটিতে অমূল্যর অরুচি নেই, তা ছাড়া হরলালের মতন তার পেট কিছু খারাপ না, ছেলেমানুষ, রুটি হজম করতে পারে—হুঁ, দু মুঠো গরম ভাত বা দু-চারখানা রুটি ও একটু তরকারি। ব্যস্, একটা তরকারি হলেই যথেষ্ট। ভাজা বা ডাল হল না, চাটনি নেই, এই জন্য অমূল্যর খুঁতখুঁতি শুরু হবে, সেই ছেলেই সে নয়। থালায় যা বেড়ে দেবে তাই সে নিঃশব্দে খেয়ে উঠবে।

এবার একটা বিছানা, মশা না লাগে তাই একটা মশারী। যেমন তেমন হলেই হল।

না, অমূল্য বিছানায় শুয়ে ছটফট করবে, অসম্ভবের স্বপ্ন দেখবে, বিরাট একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জাগবে, জেগে বিড়ি সিগারেট পুড়বে—ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে এমন আর দশটি যুবককে দিয়ে তোমরা তা আশা করতে পার। হুঁ, খারাপ অর্থে আশংকা। কেননা সবাই কিছু সুস্থ স্বপ্ন দেখে না, ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে সব ছেলেই যে আলোর দিকে তাকাবে তারও কিছু স্থিরতা নেই, অন্ধকারের হাতছানি দেখতে কত জন রাত জাগে, শোয়া ছেড়ে বিছানা থেকে নেমে পায়চারি করে। কিন্তু আমার অমূল্য—

হরলাল তার প্রমাণ পেয়েছে, নিজের চোখে দেখেছে, যে জন্য

বড় গলায় সে বলতে পারে, আমার অমূল্যর সাদামাঠা জীবন, তার চোখে হাতি-ঘোড়ার স্বপ্ন নেই, ভয়ংকরের জন্য তার তৃষ্ণা নেই।

তাই আর কারো অসুবিধে হোক না হোক অমূল্যের অসুবিধে হবে চিন্তা করে হরলাল হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে দেশলাইটা তুলে এনে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিল। চিমনিটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। কালও ছিল। যে জন্য আলোটা লালচে মরা মরা দেখাচ্ছে। কাল রাত্রেই ছোট্‌কাকে বলা হয়েছিল চিমনিটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে। রাখেনি।

সারা দিনের মধ্যে একবারও আর হরলালের কথাটা মনে পড়ল না। যেমন চিমনি তেমন পড়ে আছে। যদি মনে থাকত ছাইটাই দিয়ে নিজেই সে ওটা সাফ করে রাখত।

অমূল্য অবশ্য কিছুই বলবে না।

হ্যারিকেনের দপদপে আলো বা কালচে ঘোলাটে আলো নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার।

তবে কিনা আলোটা পরিষ্কার রাখলে মনটা ভাল থাকে, ঘরের চেহারাটা ভাল দেখায়। থালা ঘটি বিছানা আলনা আরসি চিরুনি জামা কাপড়—সব কিছুই চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে, কিছুই খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। হাত বাড়ালেই যেটা আনার আনা যায়, যেদিকে যাবার অনায়াসে পা বাড়াও, ধুঁকতে হয় না। হোঁচট খাবার ভয় থাকে না। তা না হলে নিবু নিবু আলোতেও অমূল্য মুখ বুজে অফিসের জামা-কাপড় ছাড়বে মুখ হাত ধোবে, তারপর খেয়ে শুয়ে পড়বে জানা কথা। ছোট্‌কাকে কাল বলা হয়েছিল লণ্ঠন পরিষ্কার করতে, আজ সারাদিনের মধ্যে ছেলে এই সামান্য কাজটুকু করার সময় পেলে না বলে ছোট ভাইকে ডেকে ধমক লাগাবে মারধর করবে গালিগালাজ করবে—অমূল্যকে দিয়ে তা সম্ভব না। সময় নেই তার। তা ছাড়া ক্লান্ত—ভারি ক্লান্ত হয়ে সে ঘরে ফেরে। অফিসে গাধার খাটুনি। তার ওপর ডেইলি

প্যাসেঞ্জারির ধকল। হৃদয়নগর কলকাতা থেকে খুব দূরে না। কাছে। তা হলই বা কাছে। কত কাছে রে বাবা! নিত্য ঘড়ি ধরে সময় মতন স্টেশনে ছোটা, ট্রেন ধরা, তার ওপর এক-একদিন এমন পাগলের মতন ভিড় হয় ট্রেনে! তা ছাড়া ট্রেন-লেট্ আছে, এটা ওটা নিয়ে এই স্টেশনে সেই স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার হাঙ্গামা-হুজ্জত তো লেগেই রয়েছে।

হরলালের এই অভিজ্ঞতা আছে।

এককালে উত্তরপাড়া থেকে তাকে ট্রেন ধরে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে যেতে হত না। তাও তো স্কুলের চাকরি। পাঁচ দশ মিনিট ভাল, আধঘণ্টা, এমন কি পুরো একঘণ্টা কোনোদিন দেরি করে স্কুলে পৌঁছোলেও জিওগ্রাফির টিচার হরলাল দত্তকে কেউ কিছু বলত না। অন্য শিক্ষকরা তো নয়ই, স্বয়ং হেডমাস্টার মশায় পর্যন্ত চুপ করে থাকতেন। ট্রাম-বাস না, পায়ে হাঁটা রাস্তা না ট্রেনের পথ। ট্রেন-জার্নি। শব্দটার সঙ্গে স্থান কাল ও দূরত্বের একটা অনিশ্চয়তা, নানারকম বিপদ-আপদ ও অভাবিত বা অনিবার্য রকম নানা বিশৃঙ্খলার গন্ধ জড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ হেঁটে চলার মতন ট্রাম-বাসও প্রায় তোমার মুঠোর মধ্যেই, কিন্তু রেলগাড়ি চেপে রোজ যাওয়া আসা—একটা বৃহৎ ব্যাপার। এর গুরুত্ব ও ঝুঁকি অনেক বেশি! এর সঙ্গে একদিকে হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য ও অন্যদিকে সরকার বাহাদুরের দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং একথায় ট্রেন কেন লেট্ হল বা হঠাৎ মাঝরাস্তায় গোলমালের দরুন ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল কেন ইত্যাদি প্রশ্ন করে যখন তখন তুমি একজন ট্রেন-ভ্রমণকারীর কাছ থেকে সদুত্তর আশা করতে পার না। হরলালের কাছ থেকেও মাস্টার মশায়রা তা আশা করতেন না। হরলাল পর পর তিনদিন লেট্ হাজিরা দিলে কি ট্রেন-স্ট্রাইক হওয়ার ফলে একদিন স্কুল কামাই করলে তাঁদের বলার কিছু থাকত না। তাঁরা চুপ করে জিনিসটা মেনে নিতেন।

তা-ও যদি স্কুলের চাকরি হত অমূল্যর। হরলাল চিন্তা করে। মার্চেণ্ট অফিস। খাঁটি আমেরিকান ধরনধারণ। বাপ্, পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। পর পর দুদিন লেট্ হয়েছে কি হাজিরা খাতায় নামের পাশে, অমূল্য যেমন বলে, লাল টিক্ পড়ে গেল। আধঘণ্টা দেরি করে অফিস থেকে বেরোও কর্তারা খুশি, তা বলে পাঁচ মিনিট লেট্ হবে সেটি হবার জো নেই।

অমূল্য অন্ধকার ঘরে থাকতেও রাজী। ঘরে এসে বাতির চিমনি ময়লা হয়ে আছে দেখে হৈ-চৈ করা ছোট ভাইকে ডেকে ধমক দেওয়া শাসনটাসন করা তাকে দিয়ে হয় না। হওয়া উচিত নয়। একটা অতিরিক্ত উত্তেজনা না?

উহুঁ, হরলালও এটা চায় না। শাসন করলেও ছোট্কার স্বভাবের পরিবর্তন কতটা হবে সে জানে। বরং উল্টে অমূল্যর শরীর খারাপ করবে। রাত্রে রাগ করে সে খাবে না।

হরলালের পক্ষে এটা অসহ্য। সারারাত উপোস থেকে পরদিন সাত রাজ্য ডিঙিয়ে অফিস করতে ছোটা। কালিপড়া হ্যারিকেনটা হাতে ঝুলিয়ে রাগে গটমট করতে করতে হরলাল আর একবার বাইরের বারন্দায় ছুটে এল।

বাতাস ছেড়েছে, চৈত্র মাস। কাঁচা রাস্তার ধুলো উড়ছে প্রচুর। ঝিঁঝি ডাকছে। যেন মাঝে মাঝে ব্যাঙ ডাকছে দুদিন ধরে। একটানা খরা যাচ্ছে। হয়তো এইবেলা বৃষ্টি হবে।

এই যে এলোমেলো একটা বাতাস উঠল এটা কি কালবৈশাখীর সূচনা?

হরলাল আকাশের দিকে তাকায়। এক চিলতে মেঘের মতন মনে হয় না? উত্তর পশ্চিম কোণটা কালো হয়ে আছে। যেন একটা সীসার ডেলা জমেছে ওখানটায়। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে বলে ভাল বোঝা যায় না। তা হলেও মনে হয় একটা ঝড়টড় উঠতে পারে। হয়তো মেঘের টুকরোটা এখনি দেখতে দেখতে

বড় হয়ে যাবে। হরলাল সামনের বারন্দায় এসে দু ধাপ সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে নিচে ঘাসের ওপর পা রাখল। বাঁ হাতে হ্যারিকেন। পাশের চক্রবর্তীদের বাড়িতে ইলিস মাছ রান্না হচ্ছে মনে হয়। চমৎকার গন্ধ ছেড়েছে। নগেন চক্রবর্তীর ছেলেও ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে। অমূল্যর মতন সাড়ে আটটায় ভাত খেয়ে কোন একটা অফিসে চাকরি করতে বেরোয়। টিফিনের কৌটো হাতে প্রায় অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই রোজ শিয়ালদার ট্রেন ধরতে স্টেশনে ছুটছে দেখা যায়।

হাতের হ্যারিকেনটা হরলাল উঁচু করে ধরল। ছোট্কার মতন একজন কে আসছে না? চোয়াল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে হরলাল এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে।

উহুঁ, ছোট্কা না।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওপাশটায় থাকে অমরেন্দ্র। খুব ভাল ছেলে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ক'দিন আগে খবর কাগজে ছবি বেরিয়েছিল। বস্তির ছেলে। বাবা বাত-ব্যাধিতে অচল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। বড় বোন একটা সেলাইয়ের স্কুলে চাকরি করে সংসার চালায়। মা মুড়ি ভাজে। খুবই কষ্ট করে অমরেন্দ্র স্কুলের পড়া চালিয়ে ছিল। সেই ছেলে আজ দেশের মুখ, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করল। কাগজে খুব করে লেখা হয়েছিল ছেলেটি সম্পর্কে। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে হরলাল আস্তে আস্তে আবার ঘরে উঠে এল। এখন পর্যন্ত ছোট্কা বাড়িতে ঢুকছে না। আধ ঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যেই অমূল্য বাড়ি ফিরবে। এসে কি দেখবে? ছোট ভাই ঘরে নেই। এখনও বাইরে বাইরে ঘুরছে। এদিকে আর একজন একলা একটা খুপরিতে ক্রমাগত ঠকঠক শব্দ করে চলেছে। আর এদিকে রোগা বুড়ো বাপ হাজার দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে কালিপড়া লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করে মরছে।

পায়ের শব্দ না হয় এভাবে হরলাল আস্তে আস্তে শোবার ঘরের বাঁদিকের ছোট খুপরিটার সামনে এসে দাঁড়াল।

এই মুহূর্তে শব্দটা অবশ্য থেমে আছে।

তাই তো হরলালের খেয়াল নেই, আলো নিয়ে চলে এসেছে সে এখানে। দোরটা বন্ধ। তা হলেও দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে যথেষ্ট আলো ঢুকছে ভিতরে। এ বাড়ির সব কটা দরজা জানালা এমন। পুরোনো বাড়ি পুরোনো দরজা জানালা হলে যা হয়। কাঠের পাল্লা ফেটে গেছে নয়তো স্ক্রু ঢিলে হয়ে কব্জা থেকে আলগা হয়ে একটা করে চৌকাট থেকে সরে এসেছে। ফলে দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও ভিতরে আলো থাকলে বাইরে থেকে সেটা দেখা যায়, বাইরে আলো জ্বললে ভিতর থেকে আলো চোখে পড়ে।

কাজেই তার হাতের আলো দেখেই যে মেয়েটা ঠকঠক শব্দ থামিয়ে চুপ করে আছে হরলাল বেশ বুঝতে পারল।

'ডলি!' হরলাল ডাকল।

ডলি উত্তর দিচ্ছে না।

'এই ডলি, সাড়া দিচ্ছিস না কেন?' হরলাল ধমকের সুরে বলল।

তাতে বিশেষ ফল হল না। ডলি নীরব হয়ে আছে। হরলাল এবার পাল্লার গায়ে হাত রাখল। আস্তে ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। হরলাল অবশ্য এমনটা অনুমান করেছিল।

'অমূল্য এখন ফিরবে, শুনছিস?' চেঁচিয়ে বলল সে।

'ফিরুকগে, তাতে আমার কি!' এবার ডলির গলা শোনা গেল।

'রান্নাবান্না করতে হবে না?' হরলাল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

'আমার শরীর ভাল না।' ভিতর থেকে ডলি বলল।

'তা শরীর ভাল না, এত শব্দ করছিলি কেন?'

ডলি নীরব।

'কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে?' হরলাল গলার পর্দা চড়িয়ে দিল।

'কি বলব!' ডলি ঝামটা দিয়ে উঠল।

'অমূল্য এসে খাবে না ?'

'খাবে।'

'তা ভাত রান্না করেছিস ?'

'না।'

'অমূল্য রাগারাগি করবে।' দরজার পাল্লা ও চৌকাঠের ফাঁকের মধ্যে হরলাল একটা চোখ রাখল, অন্ধকার ভিতরটা। তা হলেও যেন সে অনুমান করতে চেষ্টা করল মেয়েটা এখন কি অবস্থায় আছে। খিল এঁটে দোর বন্ধ করে রাখে, এক হিসেবে ভালই। না হ'লে এই যে হরলাল আস্তে ধাক্কা দিচ্ছিল, পাল্লাটা ঠিক সরে যেত। অবশ্য অন্ধকার বলে চট করে কিছু চোখে পড়ত না। উহুঁ পড়ত, তার হাতে হ্যারিকেন ঝুলছে না ? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরলাল রীতিমত শিউরে উঠল। ভয় পেল।

পারতপক্ষে সে বা অমূল্য এই ঘরের দরজায় হাত রাখে না বা ঠেলা দিয়ে পাল্লা ফাঁক করতে চেষ্টা করে না।

ছোট্‌কাও না।

কারণ তারা তিনজনেই জেনে গেছে সব সময় হুঁশ থাকে না ডলির, গায়ে কাপড়-চোপড় থাকে না। ইচ্ছে করে যে ডলি এটা করে তা নয়। ইচ্ছে করে কি-ই বা করছে ও। দেখে শুনে মনে হয় মেয়েটার সব ইচ্ছে মরে গেছে। এখন যা করছে সবই একটা ঘোরের মধ্যে থেকে ; সব সময় একটা আচ্ছন্নের ভাব।

'ডলি!' পাল্লা থেকে চোখ সরিয়ে এনে হরলাল আদর করে ডাকল।

'কি ?' ঠাণ্ডা গলায় ডলি উত্তর করল।

'তোর খিদে পায় না মা ?'

'না।'

'দুপুরেও দেখলাম এতটা ভাত ফেলে দিলি।' বিষণ্ণ নিস্তেজ গলা হরলালের।

'খেতে ইচ্ছে করে না।' যেন ডলি বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'ইচ্ছে না করলেও খেতে হয়।' হরলাল লম্বা করে নিশ্বাস ছাড়ল। 'না খেলে শরীর টেকে। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস।'

'মোটা হয়ে আমার কি হবে বলো!'

হরলাল নীরব।

'তুমি এখান থেকে সরে যাও। আমায় ডাকছ কেন?' যেন ওদিক থেকে সরে এসে ডলি দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'সারাদিন একটা বন্ধ জায়গার মধ্যে কি করে থাকিস তুই?' হরলাল না বলে পারল না।

'আমার ভাল লাগে।' ডলি ফিক করে হাসল। বোঝা যায় এতক্ষণ পর মেজাজটা যেন একটু ভালর দিকে আসছে।

'আহা, ভাল লাগে বলে সব সময় ওখানটায়—' একটু থেমে থেকে হরলাল আবার বলল, 'আয় না, বেরিয়ে আয়, খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালে দেখবি কত ভাল লাগে।'

'থাক, আমার ভাল লাগা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।'

'বেরিয়ে এসে আমায় একটু সাহায্য করতে পারিস।' এবার হরলালের গলায় বিরক্তি প্রকাশ পায়।

'কি সাহায্য করব?' যেন ডলিও বিরক্ত হয়।

'আমি কি একা সব দিক সামলাতে পারি?'

ডলি নীরব।

'এটা ওটা গুছোনো, ধোয়া মোছা, রান্নাবান্না।' একটু থেমে হরলাল বলল, 'বয়স হয়েছে, এদিকে শরীরটাও মোটেই ভাল না, এত খাটাখাটুনি আমার সহ্য হয়?'

খটাস্ করে খিল খোলার শব্দ হয়। পাল্লা দুটো ফাঁক করে ডলি তাকায়। মরা মিটমিটে আলো হ্যারিকেনের। তা হলেও যেটুকু আলো লাফিয়ে ছোট্ট গোলগাল মুখটার ওপর গিয়ে

পড়ে, দেখে হরলাল স্তব্ধ হয়। কতদিন চুল আঁচড়ায় না। তেল পড়ে না গায়ে মাথায়। সাবান দেয় না। ছ'দিন তিনদিন স্নান করে না মেয়ে। তারপর একদিন ইচ্ছা হল তো কুড়ি বালতি জল মাথায় ঢালল। চোখ ছুটো জবাফুলের মতন সেদিন লাল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া খাওয়া নিয়ে চূড়ান্ত অনিয়ম। ছ'দিন উপোস, একদিন আধপেটা, একদিন কেবল চা আর চা। ইচ্ছে হল সঙ্গে ছু' এক মুঠো মুড়ি। ব্যস সারাদিন আর কিছু না। আর রাত জাগার অত্যাচার। এটাই বেশি ভাবিয়ে তুলছে হরলালকে। রাত্রে কি কোনদিনই ও ঘুমোয় না। হরলালের ঘুম খুব পাতলা। সারাদিন খেটে এসে অমূল্য গাধার মতন ঘুমোয়। তেমনি ছোট্‌কা। ঐ ছেলের আর খাটাখাটনি কি। ষোল সতেরো বছর বয়েস। দাস্যির মতন খাওয়া ছুটোছুটি, তেমনি কুম্ভকর্ণের ঘুম। কাজেই পাশের ঘরে ডলি কতটা ঘুমোয়, একমাত্র টের পায় হরলাল। রাত্রেও ঠকঠক খুটখাট শব্দের বিরাম নেই। কী ভয়ানক কথা! স্টিলের বাক্সের তালা ভাঙতে চাইছে ডলি? অতটা সাহস হয়তো নেই। তা হলে অমূল্য মারধর করবে। তবু যদি তালাটা খুলতে পারে। তালার ছিদ্রের মধ্যে চুলের কাঁটা সেফটিপিন ঢুকিয়ে ক'দিন ধরে কম চেষ্টা? অমূল্য বাক্সে কিছু লুকিয়ে রেখেছে। সেই জন্য ডলির রাগটা তার ওপর বেশি।

যাই হোক, হরলাল এখন ভাবছিল শরীরের ওপর এত অনিয়ম অত্যাচার, মনের এই উদ্‌ভ্রান্ত আচ্ছন্নতা, তবু কী আশ্চর্য সুন্দর লাগে মুখটা এক এক সময়! চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে ডলি কাতর চোখে বাবাকে দেখছে।

'কি বলছ? চুপ করে আছ কেন?' ডলি ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে, অল্প অল্প হাসে। ডান হাতের হ্যারিকেন বাঁ-হাতে চালান দিয়ে হরলাল অন্যদিকে চোখটা সরিয়ে নেয়।

'তোমার শরীর ভাল না, অত খাটছ কেন?' অনুযোগের সুর মেয়ের।

'তুই যদি সাহায্য না করিস করবটা কী।' অভিমানের সুর করে হরলাল মেয়ের দিকে ঘাড় ফেরায়।

'কেন বাড়িতে অন্য লোক নেই?' ডলির হাসি নিবে যায়, ভুরু কুঁচকোয়। চিকন ভুরু, পাতলা দুটো ধানের শিষ।

হরলাল আবার হঠাৎ কথা না বলে ঢোক গিলে মেয়ের ভুরু ও ঝিনুকের মত ছোট্ট ঝকঝকে কপালটা দেখতে লাগল।

বাবা চুপ করে আছে দেখে ডলি তখনি আবার বলল, 'তবে কি তুমি আমায় দুবেলা এই সংসারের ভাত রাঁধতে বলছ, আবার এদিকে বলছ কিনা আমিও রোগা হয়ে যাচ্ছি, আমার শরীরও ভাল নেই।'

'তা তো নেই-ই, অত অনিয়ম করলে দেহ কখনো টেকে?' হরলাল মাথা ঝাঁকাল। 'উহুঁ, রান্না করতে বলব কেন তোকে, এখন এমনি বলছিলাম, সারাদিন এত ছোট জায়গায় দোর জানালা বন্ধ করে বসে থাকাটা কি ঠিক, একটু বাইরে টাইরে আসবি।'

এবার ডলি চুপ করে থাকে।

'আমি বেলাবেলি রান্না নামিয়ে ওদিকের পাট শেষ করে রেখেছি।' আলোটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখতে গিয়েও কি ভেবে হরলাল সেটা হাতেই ঝুলিয়ে রাখে। 'অমূল্যটা সারাদিন খেটেখুটে আসে, সময়মতন দুটো খেতে না পেলে, বুঝতে পারিস—'

'আমার বোঝার দরকার নেই।' ডলি ঠোঁট বেঁকিয়ে হরলালের মাথার ওপর দিয়ে দেওয়ালের ফাটলটা দেখে। একতলা বাড়ি। ছাদটা ফুটো। সারাটা বর্ষা ওদিক দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে। দেওয়ালের এই অবস্থা। 'চাকরিবাকরি করছে,' ডলি বাবার দিকে চোখ নামায়। 'বেকার না, দাদাকে বলছ না কেন বিয়ে করতে।'

'করবে করবে।' হরলাল মাথা ঝাঁকায়, 'শুনেছি সামনে একটা

ইনক্রিমেণ্ট পাবার কথা। ওটা পেয়ে গেলে অমূল্য বিয়ে করবে বলছে।'

'তাই করতে বলো, বৌ না এলে সময়মতন ভাত রেঁধে দেবে কে। এই বয়সে তুমি আর কতদিন হাঁড়ি ঠেলবে।'

বাইরে জুতোর শব্দ।

'ঐ বুঝি অমূল্য এলো।' হরলাল ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে ডলি খিল এঁটে দেয়। খটাস আওয়াজটা কেমন বিশ্রী কানে লাগে। ওদিকে আর একবার ঘাড় ফেরাতে গিয়েও হরলাল ফেরায় না। যেন জোর করে মুখটা সামনের দিকে ধরে রেখে শোবার ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি সামনের বারান্দার দিকে এগোয়।

অমূল্য একা না। সঙ্গে আর একজন। খুব ফরসা চেহারা। কালো প্যাণ্ট সাদা শার্ট। অমূল্যর চেয়ে মাথায় অন্তত দেড় দু' ইঞ্চ লম্বা। চমৎকার স্বাস্থ্য। তবে একটু টাক পড়তে আরম্ভ করেছে এই বয়সেই। হরলাল এক নজরে দেখেই বুঝল ছেলেটা অমূল্যর চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে।

'এটি কে?'

হরলালকে প্রণাম করল ছেলেটি। হরলাল অমূল্যর মুখের দিকে তাকিয়ে। অমূল্য হাসছে।

'চিনতে পারছ না?'

'না…ঠি—ক…ম—নে…করতে…' একবার ছেলেটির দিকে, একবার অমূল্যর দিকে, আর একবার ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে হরলাল অমূল্যর চোখের দিকে চোখ রাখল।

'চিত্ত, তুমি ওকে দেখেছ।' অমূল্য অল্প শব্দ করে হাসল: 'আমাদের বালিগঞ্জের ছেলে। ভবেশবাবুকে মনে পড়ে না তোমার?'

'ভবেশ সেন? উকিল? সেই লাল বাড়িটা?'

'ধ্যেৎ!' অমূল্য ঘাড় ঘুরিয়ে চিত্তর দিকে তাকায়। 'ষাটও পুরল না, এই বয়সেই বাবার মেমরি কেমন ডাল্ হয়ে গেছে ছাখো।'

উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন চোখ মেলে চিত্ত অমূল্যর বাবাকে দেখে। শব্দ করে না। গম্ভীর।

'আমাদের জামির লেনের বাড়ির উত্তর দিকে দোতলা সাদা বাড়িটা নিশ্চয় তোমার মনে আছে?' বাবাকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করে অমূল্য।

'হুঁ তা আছে,' হরলাল মাথা নাড়ে। 'ব্যোমকেশবাবু ইঞ্জিনিয়ার।'

'এই ছাখো, আবার ব্যোমকেশবাবু কেন। হ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু একজন ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর বাড়িটা আর একটু ওধারে— চিত্তর বাবার নাম ভবেশ রায়। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে', এবার হরলালের চোখে মুখে খানিকটা খুশি ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠল। 'মানে পাড়ায় তুজন ভবেশবাবু ছিলেন তো, ভবেশ রায় ভবেশ সেন, তাই গুলিয়ে ফেলেছিলাম।'

চিত্তর দিকে চোখ ফিরিয়ে হরলাল হাসল। 'অথচ খুব বেশি দিন হয় নি জামির লেন ছেড়ে আমরা এখানে চলে এসেছি। সবই মনে থাকার কথা।'

'হুঁ, তাই তো। শুনলাম অমূল্যদার মুখে।' চিত্তর মুখে এই প্রথম হাসি ফুটল। 'গেল আশ্বিনে আপনারা হৃদয়নগর এসেছেন।'

'অবশ্য চিত্তকে তোমার মনে না থাকার একটা কারণও আছে।' অমূল্য এমনভাবে বলল, যেন বাবাকে সে সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'আজ পাঁচ-ছ' বছরের ওপর চিত্ত কলকাতা ছাড়া। গেল হপ্তায় বাড়ি এসেছে।'

'কোথায় ছিলে তুমি?' অবাক হওয়ার মতন চোখ করে হরলাল চিত্তকে প্রশ্ন করল।

'বোম্বে—' চিত্ত আস্তে ঘাড় কাত করল।

'সেখানে কি—' কিছু একটা অনুমান না করে আন্দাজে হরলাল বলতে আরম্ভ করতে চিত্তর হয়ে অমূল্য বলল, 'পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে

ট্রেনিং নিয়ে চিত্ত এখন বোম্বেতে আছে, নিজে ছবি-টবি করার চেষ্টা করছে।'

হরলাল চোখ গোল করে ছেলের মুখটা দেখল।

'কি হল, মনে হয় কথাটা বুঝতে পারছ না।' বাবার চোখে চোখ রেখে অমূল্য থুতনি নাচাল।

'ফিল্‌ম ইন্‌স্টিটিউট?' হরলাল বিড়বিড় করতে থাকে।

'কেন, নামটা তুমি শোন নি?'

হরলাল শব্দ না করে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। হরলালের চোখ দেখে, মনে হল জিনিসটা সত্যি তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

'কি মুস্কিল,' অমূল্য আক্ষেপের সুর করল। 'রাতদিন লোকে সিনেমা দেখে, তুমি অবিশ্যি কোনোদিনই সিনেমা দেখ না, আমিও আগে দু'চারটে দেখেছি, এখন একেবারেই বন্ধ, ছোট্‌কার শখ আছে, কিন্তু পয়সার জন্য তারও ছবি দেখা হয় না—যাই হোক, হাজার হাজার মানুষ যে রোজ সিনেমা দেখছে এ খবর নিশ্চয় তোমার অজানা নেই—'

'হুঁ, এখানেও তো ছোটখাট একটা সিনেমা হল আছে, ওদিকে বেড়াতে গেলে টিকিট ঘরের সামনে লম্বা লাইন দেখতে পাই।' হরলাল অল্প হাসতে চেষ্টা করল।

'পাবেই, ভাত খেতে না পেলেও লোকের সিনেমা দেখার বিরাম নেই, এখন ঐ তো একমাত্র ইন্‌ডাস্ট্রি, পুণা ফিল্‌ম ইন্‌স্টিটিউট থেকে পাশ করে বেরিয়ে চিত্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নিজেই এখন বই-টই করবে। খুব ভাল লাইন।'

'সিনেমার ছবি তোলা শেখবার ইস্কুল হয়েছে বুঝি এখন?'

'তা হয়েছে বৈকি, এ-ও একটা বিদ্যা, না শিখে কিছু করা যায় না, এ তো আর গাজনের সঙ সাজা নয় যে রামা শ্যামা যদু মধু যার যেমন খুশি মুখে রং মেখে নেমে গেলেই হল।'

'হুঁ, তা-ও বটে।' হরলাল আর একবার চিত্তর দিকে তাকাল। 'বেশ ভাল করেছ, সিনেমার কাজে অনেক পয়সা আছে শুনি।'

চিত্ত আর একবার ঘাড় কাত করে হাসল। কথা বলল না।

'যাও, ঘরে গিয়ে বস তোমরা।'

অমূল্যর হাতে হ্যারিকেনটা তুলে দিয়ে হরলাল বারান্দা ছেড়ে নিচে নামল।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ছোট্‌কা এখনো ঘরে ফেরে নি। দেখছি কোথায় আছে উল্লুকটা।' ঘাড় ঘুরিয়ে অমূল্যর প্রশ্নের জবাব দিয়ে হরলাল অন্ধকারে হাঁটতে লাগল।

॥ দুই ॥

একটা মনের মতন জায়গা পেয়েছে সে। একদিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ। গাছটাকে ঘিরে নানারকম বুনো ঝোপঝাড়। বিকেল পড়তে গাছের পাতার শব্দ হয়। ঝড়ো হাওয়ার মতন বাতাস বইতে শুরু করে তখন। বুনো লতাপাতার গন্ধ নাকে লাগে। আর ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি উড়তে থাকে। একটা ইটের পাঁজা আবিষ্কার করে ছোট্কা সেটার ওপর চেপে বসল। ক'দিন ধরে বিকেল পড়তে তেঁতুল গাছটার কাছে সে চলে আসে।

আজও সারাদিন সে রাস্তায় ঘুরেছে। নতুন জায়গা। এখন আর অবশ্য ততটা নতুন নেই। পথ-ঘাট সবই চেনা হয়ে গেছে। কলকাতা শহর না। পাড়াগাঁ। ক'টাই বা রাস্তা। ক'টাই বা মানুষ। ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি দোকান-পাট। গাছপালাই বেশি। পুকুর ডোবা খানা খন্দ কত কি। ছোট্কার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের ছোট ছোট ঢেউ দেখে সে।

মাছেরা ভুড়ভুড়ি তোলে। মনে হয় জলের নিচে অনেক মাছ ঘোরাফেরা করে। ঝুপ করে কোথা থেকে একটা মাছরাঙ্গা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোঁটে করে একটা মাছ তুলে নিয়ে সোঁ করে আর একদিকে উড়ে যায়।

প্রায় বোকার মতন চুপ করে দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ছোট্কা দৃশ্যটা দেখছিল। তার খুব ইচ্ছে করছিল আমবাগানের কাছে ছুটে গিয়ে আবার মাছরাঙ্গাটাকে দেখে। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না।

ঘোষদের মেজ ছেলে, কি জানি নাম, পল্টু না বিল্টু। ছোঁড়ার চেহারাটা মনে পড়তে আর সে ওই আমবাগানের দিকে গেল না। যেতে সাহস পেল না। ওটা ঘোষদের বাগান।

রেল স্টেশনের রাস্তায় একটা বটগাছের নিচে চায়ের দোকান খুলেছে ঘোষদের ওই ছেলে। পরশু বিকেলে ছোট্কা তার দোকানে ঢুকে চা খায়। চা খেয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করবে সে দাম দিতে যাবে, দেখে পকেটটা ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল।

আশ্চর্য, তার পরিষ্কার মনে আছে সকালে বাজার করতে গিয়ে বাজারের পয়সা থেকে একটা সিকি যা হোক করে সরাতে পেরেছিল। এর জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল যদিও।

সংসারের অন্য আর পাঁচটা খরচের মতন নিত্যকার বাজার খরচটাও দাদা চালায়।

কিন্তু পয়সাটা বাবার হাত দিয়ে ঘুরে আসে। মুস্কিল সেখানে। হরলাল মুখে মুখে ফর্দ বলে দেয়। সেভাবে ছোট্কাকে বাজার করতে হয়। এটা বাদ দিয়ে ওটা আনবে, ওটা কমিয়ে সেটা আনবে তার উপায় নেই। বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরা মাত্র হরলাল হিসাব চাইতে বসে। কাজেই তখন ভয়ানক মাথা খেলিয়ে ছোট্কা বাবার কাছে হিসাব দেয়। আলু বেগুন লাউ কুমড়ো ঝিঙে কাঁচা লঙ্কার বাজার হরলালের রীতিমত মুখস্থ। কিছু ফাঁকি দেবার পথ থাকে না। রাঁধাবাড়া ধোয়া মোছার কাজ শেষ করে একটু অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াবার নাম করে হরলাল রোজ বাজারের দিকে চলে যায়। কেবল কাঁচাবাজার নয়, মাছ ও আনাজের মতন তেল ডাল নুন পেঁয়াজের দামও হরলাল এই দোকানে সেই দোকানে জিজ্ঞেস করে জেনে রাখে।

তবে মজা, আগের দিন নেই এখন আর। এ বেলা মশুর ডালের কেজি যদি আড়াই টাকা, ও বেলা কিনতে গেলে সেটা দু' পঁচাত্তর বা দুম করে তিন টাকায় উঠে যায়। তেমনি তেল নুন মশলা। এই যা একটু সুবিধে। তেমনি মাছ আনাজের দামেরও নিত্য ওঠা পড়া আছে। ওঠাটাই বেশি। পড়ছে আর কোথায়! গত বছর

ছোট্কা শীতের সময় চল্লিশ পয়সা কেজি বেগুন কিনেছে, এ বছর এক টাকার নিচে বেগুনের দর নামল? কুমড়োর কেজি এবার আশি পয়সায় আটকে আছে। এক পয়সা নিচে নামছে না। ছোট্কার মতন হরলালেরও এ-সব জানা আছে। যেজন্য দোকানে বাজারে নিত্য দু'বেলা ঘোরাফেরা করে বাবা। পাছে বাজারের পয়সা থেকে ছোটছেলে একটা পয়সাও এদিক সেদিক করে।

কিন্তু তা বলে কি ছোট্কা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে? তার হাত-খরচ আছে না? রোজ সিগারেট, রেস্টুরেণ্ট, মাঝে মধ্যে এক-আধটা সিনেমা দেখা। না, ভালমানুষ সেজে চুপ থাকলে চলে না। তাহলে ঘরে কাঁথামুড়ি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে শুয়ে থাকতে হয়। ছোড়দির মতন দোর জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে রাতদিন বসে থাকতে হয়। এই বয়সের ছেলে তা কখনো পারে?

বাজারের হিসাব চাইতে গিয়ে হরলাল যেদিন একটু বাড়াবাড়ি করে, সেদিন ছোট্কা রেগে যায়। দামের দিক থেকে বাবাকে ফাঁকি দেবার সুবিধা হয় না বলে ওজনের দিক থেকে ছোট্কা দু'-চার আনা সরাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ষাট বছর যার বয়স হতে চলল, আড়াইশ' গ্রামকে তিনশ' গ্রাম বলে ছেলে চালিয়ে দেবে, রোজ সেটা সম্ভব না। হাতের কাছে দাঁড়িপাল্লা না থাকলেও সাদা চোখে আলু বেগুনের পরিমাণটা দেখে, কি লাউ কুমড়োর ফালির চেহারা দেখে হরলাল চট করে ধরে ফেলে—উহুঁ, পাঁচশ আলু এখানে কিছুতেই হবে না, বড় জোর তিনশ হবে, এখানে দুশ'র বেশি পুঁই হবে না, তিনশ' বলছিস্, তার মানে পুঁই শাকেও তুই চার-ছ' নয়া চুরি করেছিস। আর মাছ, এ যে দেখছি বরফ-পচা ভোলা, তিন টাকা কেজি কাল বাজারে ঢেলে বিক্রী করেছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আজ বলছিস চার টাকা দাম, কিছুতেই আমি বিশ্বাস করব না।

'আজ গাড়ি আসে নি, তুমি জান? রেলের মাছ বাজারে একদম আমদানী নেই।'

'তবে অন্য মাছ আনলি না কেন, চুনো-টুনো কিছু বাজারে ছিল না?'

'ছিল, পুঁটি মৌরালা। আট টাকা কেজি। তুমি আনতে? কুচো চিংড়ি চার টাকা। চোখে দেখা যায় না এত ছোট।'

হরলাল তখন চুপ করে থাকে।

'হ্যাঁ, তবে যদি বল আঁশটে গন্ধ হলেই হল, ছোট বড়তে কিছু যায় আসে না, তাই আমি আনতাম, কাল তাই আনব। কেমন হল তো?'

'কালকের কথা কাল,' হরলাল গজগজ করতে থাকে, 'আজ এত দাম দিয়ে মাছ আনা হল, আমার মনে হয় না অমূল্য কাল আবার মাছের টাকা দেবে। কতটা মাছ এখানে শুনি?' ছেলের চোখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে তখনি থলের সব ক'টা মাছ হরলাল মেঝেয় ঢেলে এক সেকেণ্ড চুপ করে তাকিয়ে থাকে। চারদিনের বরফ-চাপা ভোলা কেমন যেন গলে গিয়ে ভেজা তুলোর চেহারা ধরেছে। চোখ বসে গেছে। আঁশগুলো খসে খসে পড়ছে। 'কতটা মাছ আনলি, দু'শ গ্রাম?' হরলাল আবার ছেলের চোখ দুটো দেখল।

'তাই তো বলি, কেন আমায় রোজ রোজ বাজারে পাঠাও, দাদা তো সেই রাত্তিরে এসে তোমার রান্না করা মাছের ঝোল খায়, এদিকের কাজ সেরে একটু বেলা করে তুমি বাজারে গিয়ে মাছটা অনায়াসে কিনে আনতে পার। মাছ, তরকারি, তেল, ডাল, নুন, মশলাপাতি—আমার তো মনে হয় সবই তোমার নিজে গিয়ে দেখেশুনে কেনা উচিত।'

হরলাল নাকের শব্দ করে হাসে। রাগ করে হাসে, রাগটা চাপতে গিয়ে হাসে। বুঝতে কষ্ট হয় না ছোট্কার।

'বেশ আছিস তোরা। একজন দোরে খিল এঁটে চব্বিশ ঘণ্টা

বাক্স-পেটরার তালা নেড়ে খটখট আওয়াজ করছে—আর একজন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এ-পড়া ও-পাড়া করছে, আর খেটে মরছে অমূল্য, খেটে মরছি আমি—অ্যাঁ, আমার এই খারাপ শরীর নিয়ে রাঁধাবাড়া করব, ঘর গুছোব ধোয়া মোছা করব, তারপর আবার বাজার করতে ছুটব—'

হরলাল প্রায় চেঁচাতে আরম্ভ করল।

'উপায় কি!' ছোট্‌কা চেঁচায় না। ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করে, 'তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করছ না, কেবল আমি বাজারের পয়সা থেকে পয়সা চুরি করি—এই অবস্থায় আমার তো মনে হয় তোমার নিজে বাজার করা উচিত, বা দাদার ওপর ভারটা ছেড়ে দিলে পার, আপিস-ফেরতা শেয়ালদা বৈঠকখানা বাজার থেকে রোজ মাছ তরি-তরকারিটা নিয়ে আসবে। দরের দিক থেকে সুবিধে হবে, জিনিসপত্রও টাটকা পাবে। তরকারিটা তো ওই বাজারে খুবই সস্তা শুনি।

'অ্যাঁ, তুই বলছিস কি রাস্কেল, সারাদিন ছোঁড়া ঘাড় গুঁজে অফিসে খাটবে, আবার কিনা গুষ্টির পিণ্ডির জোগাড় করতে এতটা পথ বাজার টেনে আনবে। কেন, কিসের তার গরজ!'

রাগে উত্তেজনায় হরলাল লাফাতে আরম্ভ করে, তার পায়ের চাপে একটা মাছের পেট গলে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে। হরলালের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, দু'হাত শূন্যে ছড়িয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে। 'উহুঁ, অমূল্য কিছু তোদের এই সংসারের জন্য মাথা বিকিয়ে দেয় নি, আমি তাকে বলব, কোথাও সে চলে যাক, আপাতত একটা মেসে বোর্ডিংয়ে গিয়ে থাকুক, দরকার নেই এখানে থেকে তার এত কষ্ট করার। তোরা খেতে পারলে খাবি, না পারলে উপোস করবি—'

'তাই ভাল, দাদাকে তাই বলে দাও, কোথাও চলে যাক, উহুঁ, তোমার জন্য আমার জন্য ছোড়দির জন্য দাদা সারাজীবন কষ্ট করবে এ একটা কথাই নয়। দাদার ওপর ঘোর অবিচার করা হচ্ছে।'

কথাটা বলে ছোট্‌কা মিটিমিটি হাসে। অর্থাৎ এই জিনিস তার দাদা অমূল্যকে দিয়ে যে কোনদিনই সম্ভব নয়, সংসারের এই তিনটি প্রাণীকে ছেড়ে দাদা নিজের সুখ সুবিধা ভবিষ্যৎ দেখতে অন্য কোথাও চলে যাবে এ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব এবং হরলালের চেয়ে আর কে এটা বেশি বোঝে, সেজন্য কি বাবার চোখে চোখ রেখে ছোট্‌কা এভাবে হাসছিল—

'শুয়ার, পাজী, বদমাস, কেমন করে হাসছে ত্যাখো।' হরলাল প্রায় তেড়ে যায়, যেন ছোট্‌কার মাথাটা তখনি দেওয়ালে ঠুকে দেবে। তেমনি হাসতে হাসতে ছোট্‌কা বারান্দা ছেড়ে লাফিয়ে উঠোনে নামে। 'বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।' হরলাল আঙুল দিয়ে সদর দেখায়। ভেংচি কেটে বলে, 'অমূল্য দু'টো রোজগার করে আনছে, তাই আজও তিনবেলা খাস। অমূল্য খরচ দেওয়া বন্ধ করলে কাল থেকে ওই মুখে আর হাসি ফুটবে না। অ্যাঁ চালাকী করছে, আমার সঙ্গে রগড় করা হচ্ছে, দাদাকে বলে দাও কোথাও চলে যাক, বাহাদুরী দেখানো হচ্ছে,—আর এদিকে এত বড় ঢেঁকি হয়েছে, আজও কিনা এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ হল না। নির্লজ্জ কোথাকার!'

'ঠিক আছে, আমিই তবে বেরিয়ে যাই, হুঁ, ঠিকই বলেছ, ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছি, মস্তবড় একটা ঢেঁকি হয়েছি, এখনও টাকা পয়সা ঘরে আনতে পারছি না, দাদার ঘাড়ে চেপে আর ক'দিন খাব, আমার লজ্জা করা উচিত। আজই এখান থেকে সরে পড়া উচিত।'

ছোট্‌কা আর হাসে না তখন। যেন দুর্জয় অভিমান হয়েছে। এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে এমন একটা ভাব করে এক পা দু' পা করে সদরের দিকে এগোয়।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস!' হরলাল আবার চিৎকার করতে থাকে, দরকার হলে বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে ছোট ছেলের পিছনে

ছুটতে থাকে সে। 'এখন কোথাও যেতে পারবি না, এই হতভাগা ছেলে, ফের, ফের! কথা আছে, শোন্!'

'কী?' ছোট্কা হয়তো তখনি আবার ঘুরে দাঁড়ায়। 'কেন ডাকছ? কি কথা আছে বলো?'

'চা খাওয়া হয়নি তোর, বাজারে চলে গেলি। এখন চা খাবি। জল ফুটছে। চট করে আমি চা-টা করে দিচ্ছি।'

'হুঁ, তারপর?' ছোট্কা থুতনিটা উঁচু করে ধরে বাবার চোখ ছুটো দেখে। 'চা খেয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, আমি আর এক মিনিট দেরী করব না কিন্তু!'

'হুঁ, এক মিনিট দেরী করব না, কেন তোকে এমন কি বলা হয়েছে যে একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাড়ি ছেড়ে যাবার হয়েছে কি শুনি?'

ছোট্কা আর কথা বলে না।

'বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাওয়া হবে?' হরলাল আবার বলে, 'জায়গা ঠিক করেছিস? চুলটা কত বড় হয়েছে তোর। বাবরির মতন দেখায়।' এক সেকেণ্ড ছেলের মাথাটার ওপর চোখ বুলিয়ে হরলাল লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'চুল কাটার পয়সা দিচ্ছ কোথায়?' ছোট্কা আস্তে বলল। খানিকটা আবদারের সুর তার গলায়।

'দোব দোব, আর ছুটো দিন যাক।' হরলালও গলার সুরটা নরম করে ফেলে। 'শুক্রবার অমূল্য মাইনে পাচ্ছে—চুলটা কাটাবি, আর ঐ তো একটা পায়জামা একটা শার্ট গায়ে পরে রাতদিন ঘুরছিস—আমি অমূল্যকে বলেছি, এ মাসে একটা নতুন পাজামা তৈরী করে নিবি।'

ছোট্কা হুঁ হ্যাঁ কিছু বলল না।

'কি হল, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'কৈ, চা কোথায়? জল ফুটছে বলছিলে।'

'হুঁ, ভেতরে আয়, উঠোনে দাঁড়িয়ে তোকে আমি চা করে দেব নাকি।'

হরলাল ঘুরে বারান্দায় উঠল।

ছোট্কার তখন বেদম হাসি পাচ্ছে। খানিকটা বকুনি লাগাবার পরেই তার বাবা কেমন যেন নরম হয়ে যায়, তখন এমনভাবে ছেলেমেয়েকে আদর করতে শুরু করে! দেখলে সত্যি বুড়ো মানুষটার ওপর মায়া হয়।

চা খেয়ে ছোট্কা হয়তো বলল, 'দাও, তোমার কাটারিখানা আমার হাতে দাও কাঠ ক'খানা কেটে দিই।'

'কাঠ কাটতে হবে না, কয়লাটা ভেঙ্গে দে বাবা, এমন শক্ত পাথুরে কয়লা দিয়ে গেছে কণ্ট্রোলের লোকটা!'

'ওর দোকান থেকে কয়লা আর আনবে না।' ছোট্কা তখনি কয়লা ভাঙ্গতে বসে যায়।

'না এনে উপায় কি, ধারে কাছে ঐ একটাই তো দোকান—তিন মাইলের মধ্যে আর কয়লার দোকান কোথায়!' হরলাল বিড়বিড় করতে থাকে।

'একটা বস্তা দিও, রেল স্টেশনের ওদিকে কয়লার দোকান আছে, আমি মাথায় করে নিয়ে আসব।'

শুনে হরলাল খুশি হয়। বাবাকে খুশি রাখতে ছোট্কা হঠাৎ এমন বাধ্যের ছেলে হয়ে যায়। প্রায় বিশ্বাস করা যায় না।

'তুই বস্তা মাথায় করে আনবি কোন্ দুঃখে।' বলতে গিয়ে হরলালের চোখ দু'টো কেমন যেন ছলছল করতে থাকে। 'আমি অমূল্যকে বলব, দূরের রাস্তা—মুটেকে এবার ক'টা বেশি পয়সা দিতে হবে—স্টেশনের কাছ থেকে ভাল কয়লা আনা হচ্ছে, এই দোকানের কয়লা দিয়ে রান্না করা যায় না।'

'হুঁ, তাই বলবে দাদাকে।' ছোট্কা মাথা গুঁজে ধুপধাপ কয়লা ভাঙ্গতে মন দেয়।

হরলাল কাছে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলের মাথার বাবরিটা দেখে। তেল পড়ে না, চিরুনি পড়ে না। সারা গায়ে অযত্ন উপেক্ষার চিহ্ন। একটু সোডার জল গরম করে গায়ের জামাটা কি কাচা যায় না। উঁহুঁ, সবটাই যে অভাবের জন্য পয়সার জন্য হরলাল তা বিশ্বাস করে না। আজকাল সব ছেলে ছোকরাই এমন। চুল কাটবে না, দাড়ি কামাবে না, নোংরা জামাকাপড় পরে ঘুরবে। ঐ যে একটা ঢেউ এসেছে।

হরলাল হঠাৎ ভাবনায় পড়ল। জামির লেনে থাকতে ছোঁড়া তো এমন ছিল না। তবে হাঁ, এখানে চলে আসার ক'দিন আগে থাকতে ছেলেটার মধ্যে ছোটখাট দু' একটা পরিবর্তন হরলালের মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল। ঐ যে, ও-পাড়ার সাধন নন্দীর সাইকেলের দোকানে অমূল্য ছোট ভাইকে সাইকেল রিপেয়ারিং-এর কাজ শিখতে পাঠায়। উঁহুঁ, অমূল্যর দোষ ছিল কি! দু-দুবার ক্লাস টেন্-এ ফেল করে ছোট্‌কা। হেডমাস্টারমশায় হরলালকে বাড়িতে চিঠি দিয়েছিলেন। বাজে আড্ডায় মিশতে আরম্ভ করেছে আপনার ছেলে। ওর দিকে একটু মনোযোগ দিন। অমূল্যও চিঠিটা দেখেছিল। এটা কোন কাজের কথা নয়—একটু-আধটু আড্ডা এই বয়সের ছেলে দেবেই—চিঠি পড়ে অমূল্য বাবাকে বুঝিয়েছিল, স্কুলের ও-পাড়ার পরিচিত ছেলেদের সঙ্গেই তো ছোট্‌কা মেলামেশা করে দেখছি, মদখোর গাঁজাখোর বা চোর বদমাশের দলে কিছু মিশছে না। আসলে লেখাপড়াটা ওর মাথায় ঢুকছে না। সবাইয়ের জন্য সব লাইন না। হাতের কাজে লাগিয়ে দাও, দেখবে ছোট্‌কা কেমন তুখোড় এক-একটা কাজ করে। কথাটা হরলাল অস্বীকার করতে পারছিল না। ও বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল। যখনই আলো কি পাখার গোলমাল হয়েছে মিস্ত্রি ডাকার দরকার পড়ত না, এটা খুলে ওটা জোড়া দিয়ে ছোট্‌কা চোখের পলকে সব ঠিক করে দিয়েছে। চেয়ারের হাতল ভেঙ্গে গেছে, কি আলমারির তালা

জ্যাম ধরে আটকে গেছে, চাবি ঘুরছে না—ডাকো ছোট্কাকে। স্ক্রু-ড্রাইভার ও হাতুড়ি নিয়ে তখনি ছুটে এসে ছোট্কা চেয়ার মেরামত করে দিল, কি আলমারির তালা খুলে চাবি চালু করে দিল। তেমনি বালতি মগে ফুটো হয়ে গেছে—দেখা গেল ছোট্কা চটপট হাত লাগিয়ে সব সারিয়ে নিচ্ছে।

'হুঁ, তাই ভাল, হাতের কাজে ঢুকিয়ে দাও ওকে, লেখাপড়া হবে না। এক ক্লাসে দু দুবার ফেল করলে কবে ও স্কুল ফাইন্যাল পাস করবে, কবে ও কলেজে ঢুকবে, তারপর সেখান থেকে পাস করে বেরিয়ে তবে না চাকরি বাকরি—হয়তো চাকরিতে ঢোকার বয়সই সেদিন ওর থাকবে না।' অমূল্যর চোখের দিকে তাকিয়ে হরলাল বড় করে নিশ্বাস ফেলেছিল। একটু থেমে বলেছিল, 'তা ছাড়া যেমন দিনকাল পড়েছে, চাকরি যে পাবেই তারও কিছু স্থিরতা নেই। বরং যা-হোক একটা হাতের কাজ শিখে রাখলে উপোসে মরবে না। কম বেশি কিছু না কিছু রোজগার করতে পারবেই।'

বড় ছেলে অমূল্যকে নিয়ে এসব ভাবনা হরলালকে ভাবতে হয়নি। একবারেই সে স্কুলের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কলেজে ঢোকে, কলেজেও কোন পরীক্ষায় সে ফেল করেনি, এক চান্সে বি. এ. পাশ করে এবং কপালগুণে একটা চাকরিও জুটিয়ে নেয়। তবে লেখাপড়ায় যেমন ভাল ছেলে ছিল সে, ইকনমিক্স-এ অনার্স, সেই তুলনায় অমূল্যর চাকরিটা তেমন ভাল হল না। তা-ও তো ছ' বছর আগের কথা। আজকের মতন চাকরির বাজারে এমন দুর্ভিক্ষ লেগে যায়নি, একটা মার্চেন্ট অফিসের কেরানির পোস্টে আছে অমূল্য, এখন এই চাকরির জন্যই কত এম-এ, ডবল এম-এ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। যে জন্য ছোট ছেলের চাকরির কথা ভাবলে হরলালের রীতিমত হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত, পাঁচ সাত বছর পরে চাকরির বাজারের অবস্থা আরও কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে ভাবলে হৃৎকম্প উপস্থিত হত।

অমূল্যর প্রস্তাবে হরলাল সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে ছোট্কার যখন এসব দিকে ঝোঁক আছে। সুইনহো স্ট্রীট ও জামির লেনের ক্রসিং-এ সাধন নন্দীর সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকান। সাধনের ভাইয়ের সঙ্গে অমূল্যর ভাব আছে। একসঙ্গে দুজন স্কুলে পড়ত। সেই সূত্রে সাধনের সঙ্গে অমূল্যর জানাশোনা। দু-চারদিনের মধ্যেই সাধনকে বলে অমূল্য তার দোকানে ছোট্কাকে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু একটা মাসও কি ছোঁড়া সেখানে টিকতে পারল। কেমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।

লজ্জায় অমূল্যর তো মাথা কাটা গেলই, হরলালও পাড়ার কোন মানুষের দিকে চোখ তুলতে পারছিল না। অথচ কতো পুরোনো বাসিন্দা তারা জামির লেনের।

কলকাতার বাস গুটিয়ে এই ধেদ্দেড়ে গোবিন্দপুর, তার মানে হৃদয়নগর যে অমূল্য সবাইকে নিয়ে চলে এল, সাধন নন্দীর সাইকেলের দোকানের ঘটনাটাও একটা মস্ত কারণ, কেবল ডলির ব্যাপারের জন্য তারা জামির লেনের বাসা ছেড়ে দিয়েছে কথাটা ঠিক নয়।

ছি ছি! সাধন নন্দীর চেহারাটা মনে হলে হরলালের বুকের মধ্যে কেমন একটা ঘেন্না বিদ্বেষ আজ দু-মাস পরেও ডেলা পাকিয়ে ওঠে।

তাই তো, ঐ ঘটনার পর থেকেই ছেলেটা যেন কেমন ভোঁতা বোকা মতন হয়ে গেল। ছটফটে ভাবটা আর মোটে রইল না। হরলাল লক্ষ্য করত লেখাপড়ায় তেমন ধার না থাকুক, সংসারের আর পাঁচটা কাজে ছোট্কার কী অসাধারণ তেজ স্ফূর্তি উৎসাহ। সারাক্ষণ ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ।

কিন্তু যেদিন থেকে তার মাথায় ঐ জঘন্য চুরির অপবাদটা চাপিয়ে দেওয়া হল, বলা যায় যেন হাত পা ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে বেচারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চোখের চঞ্চল ধারাল দীপ্তি মুছে গেছে। কল্পনা করা যায়? ওই বয়সের ছেলে! একটা ঘোলাটে নির্জীব

বুড়োটে চেহারা নিয়ে সারাক্ষণ চুপ করে ঘরে এক জায়গায় বসে আছে তো আছেই। খেতে ডাকলে খেতে চায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না বা যখন খেতে বসে তখন ঘোর অবেলা। প্রচণ্ড গরম। যেখানে দু-বেলা ত্রিশ বালতি জল ঢেলে ছোট্কার খুব করে গায়ে সাবান টাবান ঘষে স্নান করার অভ্যাস, বা ধারে কাছে পুকুর দীঘি দেখলে হুড়মুড় করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারপর দু-ঘণ্টার আগে জল ছেড়ে যে উঠে আসার নাম করে না, সেই ছেলে কিনা পর পর দু'দিন গায়ে মাথায় এক ফোঁটা জল না দিয়ে দিব্বি কাটিয়ে দিচ্ছে। যেন জ্বরে ভুগছে।

মা মরা ছেলে। সেই এইটুকুন বয়স থেকে নিজের জামাটা প্যাণ্টটা নিজেই সাবান দিয়ে কেচেকুচে নিত। উহুঁ, ময়লা জামা কাপড় পরতে ছোট্কাকে বড় একটা দেখা যেত না। যে জন্য মনে মনে হরলাল ছোট ছেলের প্রশংসা করত। প্রশংসা করত, আবার দুশ্চিন্তাও করত। বয়স বাড়লে বাবুগিরির দিকে, বিলাসিতার দিকে না ছোঁড়া ঝুঁকে পড়ে। গরিবের ঘরের ছেলে, বিলাসিতা মানায় না। পয়সা না থাকলে বাবুগিরি করবেই বা কি দিয়ে। কাজেই ছেলেকে তখন হয় বেশি রোজগার করতে হবে, নয়তো চুরি ডাকাতি ছিনতাই-এর পথ ধরতে হবে। চুরি ডাকাতি ছিনতাই করে বাবুগিরি করছে এমন লোকের অভাব আছে কলকাতা শহরে? ভাল খাব, ভাল পরব, স্রেফ এই নেশায় কত মানুষ দুর্নীতির পথে পা বাড়িয়েছে—তার যাট বছরের জীবনে হরলাল কম দেখল কি।

যাই হোক, ফরসা জামা কাপড় পছন্দ করত ছোট্কা। সাধন নন্দীর দোকানের ঘটনাটার পর দেখা গেল সাত দিন যায় দশ দিন যায়—ওই একটা প্যাণ্ট পরে আছে ছেলে, একটা জামা তার গায়ে ঝুলছে।

সব দিক থেকেই ছেলেটা কেমন যেন মরে গেল, ফুরিয়ে গেল। অনেকটা ডলির মতন।

উঁহু, ডলির পরিবর্তনটা কদিন আগে থাকতে দেখা গেছে।

ডলির নিয়তি ডলির জীবনে এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে গেল।

আর ছোট্কার মধ্যে যে সাংঘাতিক একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল তার মূলে ছিল সাধন নন্দী। বিয়ে করে যে নাকি বউকে বছরের পর বছর শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখত, আর এদিকে একটা ঝি-কে নিয়ে—

ছি-ছি! পাড়ার লোক, তাই শুনব না ইচ্ছে থাকলেও কত কথাই না কানে আসত। সাধনের ব্যক্তিগত জীবন, স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই হরলাল শুনেছিল। অমূল্যও শুনত। কিন্তু তারা তা গায় মাখে নি। সাধনের সঙ্গে ছোট্কার সম্পর্ক কতটা বা কতটুকু সময়ের জন্য?

অমূল্য বলেছিল, 'সাধনের দোকান থেকে কাজটা শিখে নে, তারপর আমি তোকে একটা সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকান খুলে দেব, খুব একটা পুঁজি লাগবে না, গড়িয়াহাট কি সাদার্ন মার্কেটের কাছে একটা ঘরটর ভাড়া করে দোকান খুললে ভাল চলবে।' দাদার উৎসাহ পেয়ে ছোট্কা খুব মন দিয়ে সাধনের দোকানে সাইকেল মেরামতের কাজ শিখতে লেগে যায়।

বেলা একটায় সাধন কর্মচারীদের জিম্মায় দোকান ফেলে রেখে ভাত খেতে বেরিয়ে যায়। ফিরতে দেরি হবে বলে দুপুরে তার ঘরে যাওয়া হয় না। রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে একটা পাঞ্জাবী হোটেলে খাবারটা সেরে নেয়।

সেদিন হোটেলে খেয়ে দোকানে ফিরে এসে সাধন নাকি আবিষ্কার করে তার ক্যাশবাক্স থেকে একশ টাকার একটা নোট অদৃশ্য হয়েছে। সাধন হোটেলে যাবার সময় সঙ্গে চাবি নিয়ে গিয়েছিল। তবে দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তালাটা বন্ধ করে গিয়েছিল কি না ভাল করে মনে করতে পারছে না। হয়তো ভুলে গিয়েছিল। এসে দেখে ক্যাশবাক্সের তালা খোলা। বা

এমনও হতে পারে, সাধন পরে পাশের মনোহারী দোকানের গিরীনকে বলেছিল, ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ছোট্কা তার বাক্সের তালা খুলেছিল। অর্থাৎ প্রথম থেকেই সাধন সন্দেহ করছিল অমূল্যর ছোটভাই ছোট্কা কাজটা করেছে। সেদিন তার পুরোনো কর্মচারীদের তুজনের মধ্যে একজন নাকি অসুস্থ হয়ে দোকানে আসেনি, এবং আর একজনকে সাধন ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দিতে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে পাঠিয়েছিল। কাজেই ঐ সময়টায় একমাত্র ছোট্কাই দোকানে ছিল।

মজা এই, অমূল্যকে ডেকে সাধন কিন্তু সরাসরি কথাটা বলে নি। বলেছিল পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে, বলেছিল স্টেশনারী দোকানের গিরীনের কাছে। তা-ও টাকা চুরি যাবার তুদিন পরে। কেন? না সাধন ভেবেছিল তার ক্যাশ-বাক্স থেকে টাকা খোয়া গেছে কথাটা জানাজানি হওয়ার পর ধরা পড়ার ভয়ে ছোট্কা নিজে থেকে নোটটা বের করে দেবে। নিতান্তই অমূল্যর ভাই, হরলালবাবুর ছেলে। একপাড়ার মানুষ। যে জন্য অমূল্য বা হরলালবাবুর কানে প্রথম হুট করে কথাটা তুলতে সাধনের খুব লজ্জাই করছিল। ছোট্কা কিন্তু প্রথম দিনই বাড়ি ফিরে দাদা ও বাবাকে ব্যাপারটা জানায়। সাধনের ক্যাশবাক্স থেকে একশ টাকার একটা নোট চুরি হয়েছে। সাধন তাকে দিয়ে সন্দেহ করছে। পরিষ্কার করে তাকে কিছু বলছে না যদিও, তার সমবয়সী দোকানের আর একটি কর্মচারী হীরুকে নাকি সাধন খুব ধমক টমক দিচ্ছিল। ধমক খেয়ে হীরু নাকি ঘাড় গুঁজে হাসছিল। অর্থাৎ ধমক ও চোখ রাঙানিটা যে ছোট্কাকে উদ্দেশ করে, ছোট্কা সেটা বেশ বুঝতে পারছিল, হীরুও বুঝতে পারছিল। ছোট্কার মুখে সব শুনে পরদিন সকালে অমূল্য সাধনের বাড়ি ছুটে যায়। সাধন তখন অমূল্যর কাছে অনেক রকম কথা বলে। একশ' টাকা নাকি এমন কিছু নয়, হয়তো ক্যাশের হিসাব রাখতে নিজেই সে ভুল করেছিল,—

এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ইচ্ছে তার নেই। ক্যাশটা সে আর একবার পরীক্ষা করবে। এখনই কারো বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করবে এতটা অবিবেচক সে নয়। তা ছাড়া ছোট্কা যেমন ভদ্রঘরের ছেলে তেমনি তার দোকানের আর দুটি কর্মচারী হীরু ও সুধীরও কিছু অভদ্র বা ছোটঘরের সন্তান নয়। দুজনেই সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছে। চাকরির বাজার খারাপ বলে তার দোকানে থেকে তারা হাতের কাজ শিখছে। তবে টাকা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সুধীর সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ ঘটনার দিন অসুখ হয়ে সে বাড়িতেই ছিল। হীরুও অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য দোকানের বাইরে যায়। ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দিতে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ দোকান থেকে ওই ছোঁড়া বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর বেলা একটা বাজতে সাধন ভাত খেতে চলে যায়। দোকানে তখন ছোট্কা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

এত সব বলার পর অমূল্যর হাত ধরে সাধন বলেছিল, 'তুমি ভাই আমার ছোটভাইয়ের বন্ধু। দুজন এক স্কুলে এক ক্লাশে পড়েছ। তোমাকেও আমি আমার ছোট ভাইয়ের মতন দেখি—এখনি তোমার মন খারাপ করার কিছু হয় নি। দোকানের ক্যাশটা আমি আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব—তা ছাড়া একশ টাকার তো মামলা, যদি হিসাব না-ও মেলে এই নিয়ে হৈ-চৈ করার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি ভাই বাড়ি ফিরে যাও।'

অমূল্য বাড়ি ফিরে এসেছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে ছোট্কার মুখে শুনল সেদিন দুপুরেও সাধন নাকি তার দোকানের আর দুটি কর্মচারী হীরু ও সুধীরের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চুরির কথাটাই বলছিল, লক্ষ্য ছোট্কা। 'তোরা সবাই ভদ্রলোকের ছেলে, বিশ্বাস করে দোকানে রেখেছি। কিন্তু হঠাৎ যে আমার এমন সর্বনাশ হয়ে যাবে—ছি-ছি, এখন আমার অবস্থা হয়েছে কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতন। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছি না,

আবার এদিকে একশটা টাকা হাওয়া হয়ে গেল, এর জ্বলুনিটাও ভুলতে পারছি না।'

সাধন সেখানেই থামে নি, চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিল, 'তবে টাকা ঠিক বেরিয়ে যাবে, আমার টাকা হজম করা শক্ত, আমিও ঘুঘু কম নই, তোরা যদি গাছের ডালে ডালে বেড়াস, আমি চলি পাতায় পাতায়······উহুঁ, সামান্য টাকার জন্য আমি থানা পুলিশ করব না—বা থালা বাটিও চালান দেব না, আমি এমন কায়দা জানি···'

সাধন এই পর্যন্ত বলার পর সুধীর ও হীরু এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে: 'না না, এই ভুল করবেন না আপনি সাধনদা। আপনি বরং এখনি থানায় গিয়ে একটা ডাইরী করে আসুন, আর ভাল গণৎকার পান তো আজই ডাকিয়ে এনে গণিয়ে নিন। গণক এসে দরকার হলে থালা বাটি চালান দেবে, আমরা রাজী আছি, তবু যদি আপনার একশ টাকার নোটটা বেরিয়ে পড়ে···'

ছোট্কার মুখে সব শুনে অমূল্য, তখনো অফিসের জামা কাপড় ছাড়ে নি, আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হরলাল লক্ষ্য করছিল, একটা চাপা রাগ ও উত্তেজনা অমূল্যকে কেমন অস্থির করে তুলেছে। ভাগ্যিস সেদিন অমূল্য মাইনে পেয়েছিল। তিনশ টাকার তিনটে নোট তার পকেটে ছিল, দুখানা নোট তখনি পকেট থেকে বের করে হরলালের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'তুমি এই দুটো রাখ, আর এই টাকাটা আমি সাধনকে এখনি দিয়ে আসছি, কাল থেকে ছোট্কা আর ওর দোকানে যাবে না···'

ঠিক এই সময় ছোট্কার চেহারাটা কেমন হয়েছিল, হরলাল আজও ভুলতে পারছে না, আগের দিন রাত্রে, পরদিন সারাটা সকাল প্রায় মড়ার মতন হয়ে ছিল ছোঁড়া। যেন এক ফোঁটা রক্ত ছিল না তার শরীরে। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে সাধনের কথা বা সাধনের সঙ্গে দোকানের আর দুটি কর্মচারী হীরু ও সুধীরের কি সব কথাবার্তা হয়, বাবার

কাছে, অমূল্যর কাছে যখন খুঁটিয়ে বলছিল, টপ টপ চোখের জল ফেলছিল সে। আর বলছিল, সুইসাইড করবে, এই মিথ্যা অপবাদ, চুরির দুর্নাম কিছুতেই সে সহ্য করতে পারবে না।

শুনে অসহায়ের মতন হরলাল ছেলের চোখ দুটো দেখছিল। অমূল্যও প্রথমটা বুঝতে পারছিল না কি করবে, কেননা সেদিন সকালে সাধনের সঙ্গে তার একরকম কথা হয়েছিল, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ছোট্‌কার মুখে সে অন্যরকম শুনছে। ছোট্‌কার মুখে সবটা শোনার পর রেগে আগুন হয়ে তার মাইনের একশ টাকার একটা নোট পকেটে নিয়ে অমূল্য যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ছোট্‌কার ফ্যাকাসে মূর্তিটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, যেন সে তখন গুলি খাওয়া বাঘ, তার চোখ দুটো জ্বলছিল। বারান্দার সিঁড়ি পার হয়ে অমূল্য রাস্তায় নামছিল, ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে ছোট্‌কা পিছন থেকে দাদার হাত চেপে ধরে।—'উঁহুঁ, কখনো তুমি একাজ করবে না দাদা, সাধন নন্দী মিছে কথা বলছে, তার টাকা চুরি যায় নি, তুমি কেন তাকে এতগুলো টাকা দেবে। আমাকে তোমাকে ও বাবাকে স্রেফ অপমান করবার জন্য ইচ্ছে করে সে তার ক্যাশ চুরি যাওয়ার কথা রটাচ্ছে—'

ছোট্‌কার কথা অমূল্য কানে তোলে নি। টাকা নিয়ে তক্ষনি সে বেরিয়ে গেছে। একশ টাকা সাধনের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে ছোট ভাইকে না, হরলালকে ডেকে সে বলেছিল, 'কাল থেকে ছোট্‌কা আর দোকানে যাবে না। তাকে তুমি বলে দিও সেখানে গিয়ে হাতের কাজ আর শিখতে হবে না।'

আজ হরলাল চিন্তা করে, অমূল্য এই জায়গায় দুটো ভুল করেছিল। নির্বিবাদে সাধনের হাতে একশ টাকা তুলে দেওয়া এবং ফিরে এসে সাধন নন্দীর সাইকেলের দোকানে পরদিন থেকে আর কাজ শিখতে না যাওয়ার জন্য ছোট্‌কাকে সরাসরি কিছু না বলে হরলাল মারফৎ কথাটা জানিয়ে দেওয়া।

পনেরো ষোল বছরের ছেলে। জীবনে এই প্রথম একটা জায়গায় কাজ শিখতে গিয়েছিল। বলা যায়, ব্যবহারিক দিক থেকে এই প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ রক্ষার সূত্রপাত। কিন্তু সুরুতেই সে এমন ঘা খেল!

তাও যদি ঘা খেয়ে সে লড়তে পারত, রুখে দাঁড়াতে পারত।

কিন্তু অমূল্য তা হতে দিল না। সাধনের হাতে টাকা তুলে দিয়ে আপস করে এল। এ দ্বারা কী বোঝাল? ছোট্‌কাই বা কী বুঝল? এবং বাইরের আর পাঁচটা মানুষ? যেন ছোট্‌কা টাকাটা চুরি করেছে। তা না হলে কোনরকম তর্ক না প্রতিবাদ না, নিঃশব্দে অমূল্য সাধনকে টাকা দিতে গেল কেন।

হরলাল অবশ্য গোড়াতেই এটা অনুমান করেছিল। দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি যাক বা না যাক, সাধন যখন ছোটকা সম্পর্কে একটা আওয়াজ তুলেছে অমূল্য এই নিয়ে সাধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে না। চিরকাল শান্তিপ্রিয় মানুষ সে। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে ছোট্‌কার তেজী তাজা মন বাঘের মতন গর্জন করে উঠতে চেয়েছিল। অমূল্য তা হতে দিলে না। ছোটভাইকে সে দাবিয়ে রাখল। তার উপর সাধনকে টাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে বাবার সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করে কথা বলা। অর্থাৎ ছোট্‌কা কাল থেকে সাধনের দোকানে আর কাজে যাবে না। দাদার এই অদ্ভুত আচরণেরই বা কী অর্থ ধরে নিল ছোট্‌কা। যেন সত্যি সে টাকা চুরি করেছে। যেন এই জন্য অমূল্য লজ্জিত ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ। সাধন নিশ্চয়ই তাকে বোঝাতে পেরেছে ছোট্‌কা ছাড়া এমন গর্হিত কাজ আর কেউ করতে পারে না। আর সেই ঘেন্না দাদার মনে রীতিমত দাগ কেটে বসল। তাই সাধনকে টাকা দিয়ে এসে বাড়িতে ছোট্‌কার মুখোমুখি দাঁড়াতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে অমূল্যর দ্বিধা? কি জানি যদি ঘেন্না বিদ্বেষ রাগ দুঃখ লজ্জা সব এক সঙ্গে মাথা চাড়া

দিয়ে ওঠে? অমূল্য তখন নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না। ছোটকাকে গালিগালাজ করতে হবে, মারধর করতে হবে—তার মানে সাংঘাতিক উত্তেজনা, সেই সঙ্গে চেঁচামেচি লাফালাফি। ফলে রাত্রে অমূল্যর খাওয়া হবে না, ঘুম হবে না। সারাটা দিন ক্লান্তি অবসাদ। সেই সঙ্গে অফিসের কাজে শৈথিল্য ভুলভ্রান্তি হাজারটা ত্রুটি। অমূল্যর পক্ষে এটা ভয়াবহ। আর যাই করুক সে, অফিসের কাজে ভুলভ্রান্তি হবে ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়। তার ওপরওয়ালা টি সুন্দরম্ চটে যাবে। পৃথিবী একদিকে, আর একদিকে তার মনিব, তার চাকরি, ম্যাঙ্গো লেনের অফিসের টিক-প্লাইয়ে ঘেরা প্রায়ান্ধকার ছোট্ট খুপরি ও তার টাইপ মেসিন। অমূল্য কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আঁকড়ে থাকবে হরলালের চেয়ে তা আর কে বেশি জানে। কাজেই চাকরির পক্ষে ক্ষতিকর হবে, এমন কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অমূল্য নেই। কোনদিন থাকে নি।

না থাক, অমূল্য অমূল্যর রাস্তায় হাঁটবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হরলালের আর একটা ছেলে?

না, বাজার খরচের পয়সা থেকে দু-চার আনা এদিক সেদিক করা অন্য জিনিস। তা বলে যে এই ছেলে কোনদিন কারো ঘরে সিঁদ কাটবে কি ওয়াগন ভাঙবে কি কারো মাথায় বাড়ি দিয়ে তার সর্বস্ব লুঠ করবে—হরলাল বিশ্বাস করে না। বেঁচে থাকার সেই দুর্দমনীয় লোভ আকাঙ্ক্ষাই যে তার মরে গেছে। প্রাণশক্তি। যদি ভাল অর্থেও কথাটা ধরা যায়। ঐ ফ্যাকাসে চোখ দুটোতে কোনদিন তেমন একটা আগুন ঝিকিয়ে উঠবে—এ প্রায় অসম্ভব।

॥ তিন ॥

তখন ঘোষেদের মেজ ছেলে বিল্টুর চায়ের দোকানে চা খেয়ে পকেট থেকে পয়সা তুলতে গিয়ে সিকিটার যখন হদিশ পেল না, এত লজ্জা পেল ছোট্‌কা। কেবল কি লজ্জা, ভয়ানক ফাঁপরে পড়তে হল তাকে। কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

বিল্টু অবশ্য খেয়াল করছিল না। ক্যাশ সামনে রেখে ওদিকের একটা চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বিড়ি টানছিল ও ভারিক্কি চেহারার একটি মানুষের সঙ্গে, তার দোকানের খদ্দের হবে, আরও কি সব ব্যবসা ট্যাবসা সম্পর্কে গুরুগম্ভীর আলোচনা করছিল। ঐ অবস্থায় বিল্টুর কর্মচারী নগেন ছোট্‌কার কাছে চায়ের দাম চাইছিল। চা ও একটা টোস্ট-বিস্কুট।

'কি হল, দামটা দিয়ে দিন। খদ্দের বসে আছে। চা দিতে হবে।' বিল্টুর কর্মচারী নগেন তাড়া দিচ্ছিল।

'আচ্ছা ঠিক আছে।' ছোট্‌কা তার সার্ট ও প্যাণ্টের পকেটগুলি খামচাতে খামচাতে প্রায় ছিঁড়ে ফেলছিল। সিকিটা না পেয়ে তার মাথা ঘুরছিল। নতুন খদ্দের দোকানে ঢুকেছে। চা দিতে হবে, নগেনের অপেক্ষা করার সময় নেই। যে জন্য নগেন ছোট্‌কার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ভেংচি কেটে বসল।

'আপনারা দোকানে ঢোকার আগে পকেটটা ভাল করে দেখে নেন না কেন? নাকি ধারে খাবেন বলে ইচ্ছে করে এসব চালাকি করছেন?'

'কিসের চালাকি!' ছোট্‌কা থতমত খেয়ে পকেটের পয়সা খোঁজা ছেড়ে দিয়ে নগেনের চোখ দুটো দেখছিল।

'ঐ আর কি!' যেন দরকার হলে ঘেন্নায় তার ডাইনে বা

বাঁয়ে বিল্টুর কর্মচারী একদলা থুথু ছিটিয়ে দিত। নিতান্তই খাবার-দোকান।

'সরাসরি বললেই হতো, পয়সা নেই ধারে চা খাব।' চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল নগেন।

'পয়সা ছিল, একটা সিকি ছিল।' রাগে অপমানে ছোট্‌কার রীতিমত মাথায় আগুন জ্বলছে তখন। 'আমি মিথ্যে বলছি না। মিথ্যা কথা বলে দোকানে ঢুকে চা খাবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি সেই ছেলে নই।'

'কি হল নগেন, ওদিকে এত গোলমাল কেন?' বিল্টুর তখন খেয়াল হয়েছে। গলা উঁচিয়ে এদিকে তাকাচ্ছে।

নগেন আর এক সেকেণ্ড দেরি করে না। ছুটে গিয়ে মনিবকে যা বলার বলে।

উফ্, তখন কি চেহারা করে ঘোষেদের মেজ ছেলে তার দিকে তাকিয়েছিল, মনে হলে ছোট্‌কার এখনও মাথাটা ঝিমঝিম করে। যেন নর্দমার একটা পোকা সে। যেন ভিক্ষুকের অধম। একবারই তার দিকে তাকিয়েছিল বিল্টু, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেই ব্যবসায়ী খদ্দেরের সঙ্গে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে বলছিল—'দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে তুমি গজাদা, এই হারামীর ব্যবসা আমি আজই পারলে ছেড়ে দি—কেবল ধার খাবার ফিকিরে আছে সব বেটা। আর খেয়ে সেই যে পিঠটান দেবে, তারপর দেড় দু মাসের মধ্যে আর এ মুখো হবে না—এভাবে কাহাতক খাওয়ান যায় তুমি বল, এভাবে লোকসান দিয়ে চায়ের দোকান চালাবার কোনো মানে হয়? তাই আমি ঠিক করেছি, যদি কোনোরকমে একটা পারমিট বার করা যায় তবে ওই জিনিসই আমি চালাব। একটু বেশি পুঁজি লাগবে, তা হলেও আমি ঠিক করেছি—'

বেশি পুঁজি নিয়ে আবার কিসের ব্যবসায় নামবে ঘোষদের মেজ ছেলে ছোট্‌কা তা জানল না। না কি জানবে বলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিল্টু তার দিকে আবার কটমট করে তাকিয়েছিল।

'সঙের মতন এখানে দাঁড়িয়ে কেন, বিনিপয়সায় চা খেয়েছ, ব্যস্ এইবেলা কেটে পড়।'

'আমি বিনি পয়সায় চা খেতে আসি নি, একটা সিকি ছিল পকেটে, হারিয়ে গেছে। পরে এসে একসময় দামটা দিয়ে যাব।' ছোট্কা উত্তর করল।

'তা যদি ইচ্ছে হয় দেবে, অনেকেই অবিশ্যি বলে যায়, তারপর ভুল করেও আর এই রাস্তা মাড়ায় না।'

'আমি সেই ছেলে নই'। বলে ছোট্কা আর দাঁড়ায় নি। গটগট করে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

পরশু বিকেলের ব্যাপার।

তারপর আজ দুদিন হতে চলল। চার আনা পয়সা কিছুতেই সে যোগাড় করতে পারছে না। কাল বাজার হয় নি। আজও না। মাসের শেষ। অমূল্যর হাতে পয়সা নেই। আজও সে মাইনে পাবে কিনা ঠিক নেই। আজ তো মাইনে পায় না। উহুঁ, পয়লা তারিখে অমূল্যর অফিসে বড় একটা মাইনে হয় না। আজ সকালেও হরলাল বলছিল। সেই হতে হতে দু তারিখ তিন তারিখ। যে জন্য পাড়ার মুদি দোকান থেকে খাতায় লিখে অর্থাৎ ধার করে আলু পোস্ত ও মসুর ডাল আনতে হরলাল কাল ছোট্কাকে পাঠিয়েছিল। আজ সকালেও তাই হয়েছে।

ফি মাসেই এটা হচ্ছে। মাসের শেষের দু তিন দিন কাঁচা বাজার একেবারে বন্ধ থাকে। তখন স্রেফ ডাল পোস্তর বড়া আলু ভাতে আলুর ঝোল চলতে থাকে। আর তখন যেন হরলাল খুব নিশ্চিন্ত থাকে। ছোট্কা বাজার খরচ থেকে একটা পয়সাও চুরি করতে পারে না। কেননা পয়সাই তার হাতে দেওয়া হয় না। খাতায় লিখে ধারে জিনিসপত্র আনার সুবিধে এটা।

হরলালের দিক থেকে সুবিধে।

কিন্তু ছোট্‌কার মনের অবস্থা তখন কেমন দাঁড়ায়?

মুদিখানার খাতাখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারলে তার রাগ কমত। তেঁতুলতলায় ইটের পাঁজার ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে তাই সে চিন্তা করছে এখন।

কী কাণ্ড! আজ দু'দিন ধরে একটা বিড়ি কেনার পয়সা নেই।

যে জন্য তার রাস্তায় বেরোনো একদম বন্ধ হয়ে গেছে। বিল্টুর চায়ের দোকানে পয়সা পাবে। আর একদিন কি জানি মনে হয়েছিল, মুড়ি দিয়ে ফুলরি খেয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় মোড়ের তেলে ভাজার দোকান থেকে। চৌদ্দ পয়সার মামলা। ভেবেছিল পয়সাটা সেদিনই বিকেলে দিয়ে দেবে। তাও আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। লোকটার নাম প্রসন্ন। ছোট্‌কারা এ-পাড়ায় নতুন এসেছে। প্রসন্ন ধারে মুড়ি তেলেভাজা দিতে চায় নি। আমি ঠিক দিয়ে দেব পয়সাটা —বিকেলেই তোমার ধার শোধ করব দেখ। ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমাদের তো এ-পাড়ায় থাকতে হবে। পালাতে পারব না। বলে সে হেসেছিল।

প্রসন্ন আর আপত্তি করে নি।

মুখটা বেজার করে ঠোঙ্গায় করে তার হাতে মুড়ি ও ফুলুরি তুলে দেয়।

আসলে দোকানদাররা কেউ খারাপ না। খদ্দেরকে তারা বিশ্বাস করে। কিন্তু বিশ্বাসটা আমরাই ভেঙ্গে দেই। চিন্তা করে ছোট্‌কা বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। খুব হয়েছে না সেদিন বিকেলে প্রসন্নর ধার শোধ করা! আজ নিয়ে তিনটে বিকেল পার হতে চলল। এভাবে আর ক'দিন চলে!

আপাতত মাছরাঙ্গাটাকে দেখতে ঘোষদের বাগানটার দিকে আর একবার চোখ ফেরাতে সে চমকে উঠল। তারপর খুশি হল। মনে হয় ধারে কাছে কোথাও একটা বুনোফুল ফুটেছে এই সন্ধ্যার

মুখে। টাটকা সুন্দর তাজা গন্ধে জায়গাটা ভরে যাচ্ছে। আমাকে মাতাল করে দেবে মনে হয়, ভাবল সে। লাফিয়ে ইটের পাঁজা থেকে সে নেমে দাঁড়াল।

না, বিশ্বাস করা যাবে না, ভাবনার অতীত, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। যদি না চোখে দেখা যেত। কিন্তু কে দেখবে!

জায়গাটা ওরা বেছে নিয়েছে এ জন্যই। যাতে কেউ দেখতে না পায়। এ পাশটায় ফণীমনসার ঘন ঝোঁপ, ওপাশটায় মেহেদীর বেড়া। তাছাড়া তেঁতুল গাছটার গুঁড়ি ঘিরে বনতুলসীর জঙ্গল। আর মস্তবড় ইটের পাঁজাটা। একটা দেওয়ালের মতন দীঘির পাড়ে এতটা জায়গা ঘিরে রেখেছে।

লুকিয়ে দুটি মানুষের একত্র হওয়ার চমৎকার সুযোগ এখানে। বিশেষ করে এই সন্ধ্যার মুখে।

'কতক্ষণ বসে আছ?'

'অনেকক্ষণ।'

'কি করছিলে?'

'বা—রে, কি আবার করব, তোমাদের বাগানের দিকে মাছরাঙ্গাটা উড়ে গেছে। ওদিকে তাকিয়েছিলাম।'

'এগিয়ে গেলে না কেন?'

'সাহস পাই না।'

'কেন!' ফিক করে শোভা হাসল।

লম্বা শরীর শোভার। বেতডগার মত ছিপছিপে। পাতার রঙের শাড়ীটায় খুব মানিয়েছে। মনে হয় যেন মানবী নয় ও, চারপাশের ঝোঁপঝাড়ের একটা অংশ। একটি বুনো লতাটতা। হেসে ছোট্কার কাঁধে হাত রাখল ও। 'তুমি বেজায় ভীতু। একদিন আমাদের বাড়ি গেলে পারতে।'

'তোমার দাদা বিল্টুকে ভয় করে।' এক সেকেণ্ড থেমে থেকে ছোট্কা আবার বলল, 'এই কদিনে সাহসটা প্রায় এসে যেত,

বাড়িতে না ঢুকলেও তোমাদের বাগানের দিকে ঠিক চলে যেতে পারতাম। পরশু তোমার দাদার দোকানে চা খেয়ে পয়সা দিতে পারি নি। কাজেই এখন ভয়ের চেয়ে লজ্জাটাই বেশি করছে।'

শোভার চোখমুখ কুঁচকে উঠল।

'কত পাবে দাদা?'

'চার আনা। এক কাপ চা ও একটা বিস্কুটের দাম।' ছোট্‌কা কিছুই গোপন করল না।

'হঠাৎ ধারে খেতে গেলে কেন? তুমি তো জান আমার দাদার ভীষণ পয়সার লোভ। পাছে পয়সা মারা যায় সারাক্ষণ এই ভয়। দোকানে কাউকেই ধারে কিছু দিতে চায় না।'

ছোট্‌কা চুপ করে রইল। তার চোখের সামনে বিল্টুর মুখটা ভাসছে। প্রায় ছোট্‌কার বয়সী। কিন্তু ছোট্‌কার মতন একমাথা রুক্ষ চুল নেই। গায়ের জামা প্যান্টও কিছু নোংরা নয়। বেশ ফিটফাট পোশাক। হাতে ঘড়ি। চাঁছা-মাজা-ঘষা ঘাড়ে পাউডারের ছোপ লেগে থাকে অধিকাংশ সময়। যেন সার্টের নিচে থেকে গলায় একটা সরু সোনার চেনও উঁকিঝুঁকি দেয়। দুহাতে দামী পাথর বসান আংটি।

'ঠিক আছে।' শোভা বলল, 'আমি তো জানি না, কাল বিকেলেও তুমি একথা আমায় বল নি। মার কাছ থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে এনে তোমাকে আমি দেব। দাদার চায়ের দাম মিটিয়ে দিও।'

হাওয়ায় শোভার কপালের চুল উড়ছিল। ছোট্‌কা একটা চুল ওর কপাল থেকে সরিয়ে দিল।

'না না, আমিই পয়সা দেব, আর একটা দুটো দিন দেরি হবে। মার কাছ থেকে তোমাকে পয়সা চাইতে হবে না।'

'চাইলাম বা, তাতে ক্ষতি কি, দোষের কিছু হচ্ছে না তো।' —ছোট্‌কার কপালের চুলও হাওয়ায় উড়ছিল। শোভনা আঙুল বাড়িয়ে একটা চুল ছুঁয়ে দেখল।

'চুলটা কেটে ফেল। এত লম্বা চুল ভাল লাগে না। পাগলের মতন দেখায়।'—আদুরে গলায় শোভা হিস্‌হিস্ করে উঠল।

চুল কাটার পয়সা নেই, ছোট্‌কা এখন বলল না। চুলের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল সে। শোভার দাদার পাওনা চার আনার কথাটাই সে তুলল।

'ছি, তোমার মার কাছে পয়সা চাইবে না। আমার খারাপ লাগবে। তুমি সেদিন বলছিলে না তোমার দাদা তোমার বা তোমার মায়ের বা তোমার অন্য ভাইবোনদের হাতে কোনদিন একটা পয়সা দেয় না? টাকাকড়ি সব নিজের হাতে রাখে।'

'হুঁ, তা রাখে। তবু দেখি যদি দু-চার আনা মার হাতবাক্সে থেকে থাকে।'

'তোমার দাদা বিল্টু মানুষটা বেজায় স্বার্থপর।' কেমনতর একটা বিদ্বেষ নিয়ে ছোট্‌কা আবার বলল।

'তা আর বলতে।' শোভা ঠোঁট বেঁকাল। 'বলেছি, ভীষণ পয়সার খাঁই। এই বয়সেই একটা পয়সাকে দাদা নিজের বুকের একফোঁটা রক্তের মতন দেখে। দেখছ না কেমন সোনার আঙটি, চেন পরে আছে! অথচ বাবার টাকায় ওই চায়ের দোকান। দোকানের ভাল আয়। ওই থেকে আমরা ভাইবোন কি আমার মা এক পয়সা ভাগ বসাবে ভাবতেও দাদা শিউরে ওঠে।'

'আমার দাদা অমূল্য ঠিক উল্টো। কত কষ্ট করছে আমাদের জন্য,' ছোট্‌কা বলল, 'চাকরি করে যা রোজগার করছে সব আমাদের পেছনে খরচ করছে দাদা। নিজের কিছুই রাখছে না। মাইনে পেয়ে ট্রেনের একটা মান্থলি করে নেয়—নিজের খরচ বলতে শুধু ওই। সিগারেট না, পান না, সিনেমা না, থিয়েটার না।'

'হুঁ, দেখেছি।' শোভা থুতনি নাড়ল।—'রোজ সকালে আটটা বাজতে টিফিনের কৌটো হাতে অফিস করতে কলকাতার ট্রেন ধরতে ছুটছে। দেখলে মায়া হয়।'

'আমাদের জন্য দাদা একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারছে না।' ছোট্কা মাথা ঝাঁকায়।

'তাই তো দেখছি। কেমন দিন-কাল!' শোভা বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল। 'আর একটা মানুষ সংসারে এলেই তো খেতে দিতে হবে, পরতে দিতে হবে।'

'বাবা তাই বলছিল, আমাদের জন্য সারাজীবন কত কষ্ট করবি। এইবেলা তুই একটা বিয়ে-থা করে একটু সুখের মুখ ত্থাখ—আমাদের যেভাবে চলার চলবে।'

কথা না বলে শোভা ঢোক গিলল। তারপর কিছু একটা ভেবে খুক করে হাসল।

'হাসছ?' ছোট্কা চমকে উঠল।

'আমার নিজের দাদা বিল্টুর কথা ভাবি। পয়সার অভাবে তোমার দাদা বিয়ে করছে না। আর আমার দাদা ব্যাঙ্কে এত টাকা জমিয়েছে—তবু বিয়ে করার নাম নেই।'

'কেন?' শোভার হাসিটা হেঁয়ালির মতন লাগছিল। চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে ছোট্কা আবছা অন্ধকারে ওর ফলের মতন কাঁচা একটু বা শক্ত মুখটা দেখল।

'কেন বিয়ে করে না আমাদের বিল্টুবাবু বুঝতে পারছ না? বৌয়ের ভাত কাপড়ের খরচ আছে। গয়নাগাটির খরচ আছে। তেল সাবান স্নো পাউডারের খরচ আছে। আর একটা মানুষের জন্য এত খরচ করবে ভেবে বিল্টু বিয়ের নাম শুনলে আঁৎকে ওঠে।'

শোভা এমন চমৎকার ভঙ্গী করে কথাটা বলল, ছোট্কা শেষ পর্যন্ত না হেসে পারল না।

'তা বৌকে ভাত কাপড় দিতে হবে ভয়ে নিজে বিয়ে করছে না, না করুক, কিন্তু বোনকে বিয়ে দিতে হবে তো, তখন বিল্টুবাবুর টাকা খরচ না করে উপায় কি। এ—তো টাকা খরচ করতে হবে যে বোনের বিয়ের জন্য।'

ঠিক এমন একটা কথা হঠাৎ ছোট্‌কার মুখ দিয়ে বেরোবে, শোভা আশা করে নি। চুপ করে রইল। মুখটা বেজায় গম্ভীর করে ফেলল।

ঝিঁঝি ডাকছিল। দুজনকে ঘিরে জোনাকি নাচছিল।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।' যেন অনেকক্ষণ ভাববার পরে শোভা বলল, 'টাকা খরচ করতে হবে ভয়ে দাদা আমার বিয়ের কথা উঠলে সেটা চাপা দিতে চাইছে। আমার জন্য ক'দিনই ছেলে খোঁজ করার কথা তুলেছিল মা। দাদা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়েছে ঃ এখনি ওর বিয়ের ভাবনা ভাবছ তুমি? আশ্চর্য, পাড়াগাঁয়ে আছ কিনা তাই। শোভার বয়সের মেয়েরা শহরে ফ্রক পরে ইস্কুলে যায়। বিকেল পড়তে পার্কে মাঠে ঘোরে, দৌড়ঝাঁপ করে, আচার ঘুগনি কিনে খায়, ল্যাকটো বন্‌বন্‌ গালে ফেলে স্কিপিং করে, বাদলার দিনে বাড়ি থেকে বেরোতে না পারলে ঝমঝম বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাট্টুঘোড়ার মতন বারান্দায় ব্যালকনিতে হরদম লাফায়, এই বয়সে বিয়ের নাম শুনলে খেপে গিয়ে ওরা তোমাকে ঠিক খুন করতে চাইবে।'

শোভা থামল। ছোট্‌কা হাসল। তবু হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে ছোট্‌কার বুকের ভিতর ধ্বক করে উঠল।

অন্ধকারটা এত গাঢ় হয়েছে—এ ওর মুখ আর ভাল দেখতে পাচ্ছিল না।

চলি, বলতে যাচ্ছিল ছোট্‌কা।

আর সেই মুহূর্তে নিবিড় করে শোভা তার ডান হাতটা চেপে ধরল। অর্থাৎ কথা শেষ হয় নি। বিয়ের ব্যাপার উঠলেই লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মতন অনেকক্ষণ ধরে মেয়েরা বকতে থাকে জানা কথা। বকতে ভালবাসে।

'দাদা আমার বিয়ে দেবে সেই ভরসায় আমি বসে নেই তুমি জানবে।'

'তাই নাকি!' ছোট্‌কা ঢোক গিলল।

'আহা যেন বুঝতে পারছে না। কচি খোকা!' হাত ছেড়ে দিয়ে শোভা রাগ করার মতন একটা ভঙ্গি করল।—'তুমি কি ভাবছ দাদার পছন্দ করা ছেলের গলায় মালা দেব!'

'তবে? তা হলে?' ছোট্‌কা বিড়বিড় করে উঠল। 'কী করবে ঠিক করেছ।'

'ওমা, কী ক্যাবলা তুমি!' যেন বিরক্ত হয়ে ছোট্‌কার গালে একটা ঠোকর দিতে চাইল শোভা।—'পুরুত ডেকে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে ছাদনাতলায় বিয়েটাই কি সব—এ ছাড়া একটি ছেলে ও একটি মেয়ের বিয়ে হয় না?'

'হুঁ, হয়।' ছোট্‌কা মাথা ঝাঁকাল। 'রেজিস্ট্রি করে।'

'সে তো শহুরে জিনিস। এখানে? এই যে ঝিঁঝি ডাকছে জোনাকি জ্বলছে, বুনো লতাপাতার গন্ধ ছড়িয়ে এলোপাথাড়ি বাতাস বইছে, একটু পরেই সাত বোন তারা আকাশে ফুটবে—ডাইনে বাঁয়ে তুমি আমি ছাড়া কাক প্রাণীটিও চোখে পড়ছে না, এমন জায়গায়, এই জঙ্গলে একজোড়া ছেলেমেয়ের কি করে বিয়ে হয় বলো তো?'

ছোট্‌কা চুপ। যেন পাথর হয়ে গেছে সে। গলাটা উঁচু করে ধরে তার গালের কাছে, কানের কাছে শোভা মুখটা সরিয়ে এনেছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল ওর। গরম। ছোট্‌কার গালে কপালে গরম শ্বাসের আঁচ লাগছে।

মুখটা সরিয়ে নিচ্ছিল ছোট্‌কা।

শোভা শক্ত করে তার কাঁধ দুটো চেপে ধরেছে। বোঝা গেল তার মুখে উত্তর শুনতে চাইছে শোভা। ছোট্‌কা কিছু বলুক। এই মুহূর্তে কিছু বলুক। কানে কানে বলুক।

আমি বলতে পারব না, আমি জানি না এভাবে কি করে দুটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়! যন্ত্রণা পাওয়ার মতন চেহারা করে ছোট্‌কা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার দরকার হল না।

অপরূপ শব্দ করে মেয়ে হাসল।

'বুঝেছ, মন, মনের বিয়ের চেয়ে বড় বিয়ে আর হয় না।'

তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে শোভা আস্তে বলল, 'তাই না?'

'হুঁ,' ছোট্‌কা মাথা ঝাঁকাল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে হরলালের গলা শোনা গেল। তার নাম ধরে ডাকছে। বাবা তাকে খুঁজছে। —'চলি।' মৃদু গলায় বলল সে।

শোভা তার কাঁধ ছেড়ে দিল। দুজনে দুদিকে সরে গেল। দুটি ভীরু পায়ের নীচে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ ছাড়া আর শব্দ ছিল না।

॥ চার ॥

হ্যারিকেনের ময়লা চিমনির ভিতর লাল শিখাটা দুটো লাফ দিয়ে নিবে গেল।

'তেল ফুরিয়ে গেছে।' চিত্ত বলল।

'হুঁ।' চিত্তর দেওয়া সিগারেটটায় আর একটা টান দিয়ে শেষ টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল অমূল্য। দুবার কাশল। অভ্যাস নেই তেমন। তবু অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু সিগারেট অফার করতে অমূল্য সাগ্রহে সেটা নিয়েছে এবং ধরিয়েছে। তা ছাড়া চিত্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা নেশার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যেন চিত্ত তখন গেলাসে মদ ঢেলে দিলে অমূল্য তা-ও তুলে নিয়ে গলায় ঢালত। 'তেল ফুরিয়েছে।' জানালা গলিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে চিত্তর দিকে আবার ঘুরে বসল অমূল্য। 'আমার তেলও ফুরিয়ে এসেছে। এভাবে আমিও একদিন ফুটুস করে শেষ হয়ে যাব।'

এখন অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। তবু আবছা আবছা রেখার দুটি অবয়ব পরস্পরের উপস্থিতি টের পাচ্ছিল। খোলা জানালা দিয়ে তারায় ভরা আকাশের আলো ঢুকছিল তো। হ্যারিকেন নিবল বলে মূর্তি দুটো মুছে গেল না।

অমূল্যর কথা শুনে চিত্ত গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। নিশ্বাসের শব্দটা শুনল অমূল্য।

'কাজেই আমি ঠিক করেছি,' অমূল্য আবার বলল, 'এভাবে শেষ হওয়ার চেয়ে মানে রোজ একটু একটু করে মরতে মরতে ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমি নিজেকে শেষ করব। সুইসাইড করব।'

শুনে চিত্ত চমকে উঠল না। উত্তেজিত হল না। বন্ধুকে ধমক

দিল না। যেন এই জীবনের এই পরিণতি খুব একটা অস্বাভাবিক না ধরে নিয়ে বেতের সোফায় বসা অমূল্যার মূর্তিটার দিকে চোখ রেখে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কিন্তু আমি ওদের কাউকেই বুঝতে দিচ্ছি না,' অমূল্য বলে যেতে লাগল, 'বাবাকে না ডলিকে না ছোট্কাকে না, যে জন্য ওরা ধরে নিয়েছে আমার তেল কোনদিন ফুরোবে না। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার আমার এই দেহটা। এই শক্তি খাটিয়ে চিরকাল ওদের সকলকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখব। আমি কখনো ক্লান্ত হব না, নির্জীব হব না। আলু ভাতে ভাত খেয়ে রোজ অফিস করতে আটটা ছেচল্লিশের ট্রেনে চাপব, দুপুরে দু টুকরো শশা বা একটু ঘুগনি খেয়ে টিফিন সারব—আর কাজ—কাজ।' অমূল্য থামল।

এবার চিত্ত চটে গেল। 'এটা তোমার অন্যায়। তুমি যা করতে চাইছ, ভালবাসতে চাইছ, তা তুমি করছ না। নিজেকে এভাবে প্রতারিত করছ তো বটেই, আমি বলব তোমার ছোটবোন, ভাই ও বাবার সঙ্গেও আর একভাবে প্রতারণা করছ। ভেতরটা লুকিয়ে রেখেছ, কেবল তোমার বাইরের চেহারাটা ওদের চোখের সামনে ধরে রেখেছ। ওরা বুঝতে পারছে না তোমাকে, যে জন্য ওরা আজও এত নিশ্চিত নির্ভয়—এটা কি ঠিক।' অমূল্য হাতের আন্দাজে চিত্তর সিগারেটের প্যাকেট থেকে, যা তার পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক, আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে মুহূর্তের জন্য তার চোখের তারা ও চিবুকের কঠিন রেখাটা চিত্ত দেখে ফেলল। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ঐ সময়টায় অমূল্যকে ভয়ানক হিংস্র ও কুৎসিত দেখায়! যেন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ভিতরের আসল মূর্তিটা অমূল্য একেবারে উলঙ্গ করে ধরেছে।

চিত্তর গলার স্বর তেমনি কঠিন। 'আজ বলছ আত্মহত্যা করবে।' অমূল্যর বিছানায় গা এলিয়ে বসেছিল চিত্ত, হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'আদৌ আত্মহত্যা করবে কিনা জানি না। কেননা বলে কয়ে

অনেকেই এই জিনিস করতে পারে না। তবে এ থেকে তোমার একটা মতলব, একটা ঝোঁক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সকলকে এক সঙ্গে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি সরে পড়তে চাইছ।'

'সরব কোথায়, বলছি তো মরব—নিজের হাতে নিজেকে মেরে ফেলে—' বিকৃত গলায় অমূল্য হাসল।

'ঐ, একই কথা হল। তুমি এখন মনের মতন বউ চাইছ, আলাদা ঘর চাইছ, ভাল খাওয়া-দাওয়া পোষাক-পরিচ্ছদ—যেমন সংসারে চৌদ্দ আনা পুরুষ চায়—ভাল কথা, কিন্তু কথা হচ্ছে অত সব কামনা বাসনা ভাই বোনের কাছে, বাবার কাছে তুমি এতকাল লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ভাবতে আমার সত্যি খুব অবাক লাগে।'

'কখন ওদের বলতাম বলো', মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে অমূল্য সামান্য কাশল। 'কলেজের পড়া ছাড়তে না ছাড়তে অসুখ হয়ে বাবা বাড়িতে বসে গেল, চাকরি করা আর তার হলো না। রুজি-রোজগার বন্ধ হলো। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হলো আমাকে। ইতিমধ্যে মা'ও মারা গেল। আপোগণ্ড দুটি ভাইবোন আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। রোগা বুড়োর সেবাযত্ন, ভাই-বোনদের দেখা-শুনা, চাকরি—একটানা এতোগুলো বছর কি ভয়ঙ্কর চাপের মধ্যে ছিলাম আমি, শ্বাস ফেলারও আমার সময় ছিল না যে।'

'আহা, যখন তুমি শ্বাস ফেলতে পারলে, মানে ডলি বড় হয়ে উঠল, ছোট্‌কাও কিছু দুধের বাচ্চা হয়ে রইল না, গ্যাসট্রিকের রুগী তোমার বাবা চিরকাল বিছানায় শুয়ে থাকেননি নিশ্চয়ই, এখন তো দেখছি মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্য বুড়োর, চলাফেরা করেন, কাজকর্মও যেন করেন—এই সময়টার মধ্যে তুমি ওদের জানিয়ে দিলে পারতে, আমার এই চাই, ওই চাই, আমি কিছু চিরকাল তোমাদের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে—'

'চুপ চুপ, আমায় বলতে দাও, শেষ করতে দাও।' মোড়ায় বসা অমূল্য বিছানার দিকে ঝুঁকলো। 'তুমি ক'বছর কলকাতায়

ছিলে না, কিছুই দেখলে না, জানলে না, তাই একথা বলছ। হুঁ, বড় হয়ে উঠল ডলি, কিন্তু কতটা বড় হয়েছে ও। ছোট্কা আর দুধের শিশু নেই, গোঁফদাড়ি গজাবার বয়স হয়েছে তার, কথাটা কতটা সত্য? দুদিন তুমি এখানে এসে থেকে দেখে যাও—'

'দেখার দরকার নেই। যতটা মনে পড়ে, আমার হিসেব মতো ডলির এখন কুড়ি-একুশ বয়স হবে, ছোট্কার পনেরো-ষোল, কাজেই যথেষ্ট বড় হয়েছে দুটিতে, তুমি যদি তোমার ভেতরের ইচ্ছেটা ওদের কাছে প্রকাশ করতে, অন্তত তোমার বাবাকেও কথাটা জানতে দিতে মনের দিক থেকে ওরা সকলেই এতদিনে প্রস্তুত থাকতে পারত, অন্ধের মতো তোমার ওপর নির্ভর না করে—'

চিত্তর কথা থেমে গেল। পাশের একটা ঘরে বিশ্রী খটখট আওয়াজ হচ্ছে। এর আগেও দুবার শব্দটা তার কানে এসেছে। অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু এখন যেন শব্দটা আর থামছেই না।

'কে এমন করছে—'

'ডলি,' অস্ফুট গলায় অমূল্য উত্তর করল।

চিত্ত আবার কান খাড়া করে শুনল। শোনার পর অমূল্যর দিকে ঝুঁকল, 'মনে হয় যেন কোন বাক্স-পেঁটরার তালা-টালা খুলতে চাইছে?'

'তালা ভাঙ্গতে চাইছে।' খসখসে গলায় অমূল্য হাসল। 'তোমার আন্দাজটা প্রায় কাছাকাছি গেছে দেখছি।'

'বাক্সের মধ্যে কী আছে?' চিত্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'ওর বরের ফটো, চিঠি।'

'সে কি, ডলির বিয়ে হয়ে গেছে?'

অমূল্য ঘাড় কাত করল। অন্ধকারে চিত্ত দেখল না।

'কি হল, চুপ করে আছ?' চিত্ত আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

'হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ, ক'টা বছর তো তুমি ছিলে না কলকাতায়

—তাই আমাদের এই সংসারের সব কিছু দেখ নি তুমি, জান না, একটু আগে যা বলছিলাম।' অমূল্য ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল।

'কবে বিয়ে হলো ডলির?'

'এই তো তোমার বম্বে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।'

'অ্যাঁ, তা হলে, তা হলে তো আমার হিসেব মতন ছ'বছরের ওপর ডলির বিয়ে হয়েছে?'

'প্রায় তাই, এই আশ্বিনে ছ'বছর পুরবে।'

'ইস্, ডলির বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি।' যেন একটু হতাশার গলায় কথাটা বলে চিত্ত চুপ করল। অমূল্য জোরে জোরে সিগারেটটা টানতে লাগল। আর কাশছিল না এবার।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে,' যেন মনে মনে আর একটু হিসেব করে নিল চিত্ত, 'সেই স্কুলে পড়ার সময় ডলির বিয়ে হয়েছে, তাই না?'

'হুঁ, তাই।'

'ছেলেটা কোথায় থাকে এখন? কি করছে?' অমূল্য সিগারেটের শেষ টুকরোটা নিবিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল। হঠাৎ কথা বলল না।

'একেবারে ফ্রক পরা বয়সেই বিয়ে হল ডলির। ভাবতে যেন কেমন লাগছে। সেই তো দেখে গেলাম, স্কিপিং করত স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, তোমাদের বাড়ির সামনের পার্কটায়, কী ভীষণ ছুটো-ছুটি হুটোপাটি না করত ডলি আর ডলির বয়সের গুচ্ছের মেয়েরা, এখনো সব চোখে ভাসছে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আচার ঘুগনি কিনে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে ওরা। লজেন্স, ল্যাকটো বনবন।'

যেন একটা আবেশ নিয়ে অতীত স্মৃতি-রোমন্থন করার মতন করে চিত্ত বলে যাচ্ছিল।

পাশের ঘরে খটখট শব্দটা থেমে আছে কিছুক্ষণ। বাইরে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে একটানা।

'অমূল্য, কথা বলছ না তুমি!' চিত্ত ডাকল।

'হুঁ, আর্লি ম্যারেজ, এতটা কম বয়সে ডলির বিয়ে হোক আমি চাই নি।' অমূল্য আস্তে বলল।

'তবে কি তোমার বাবার ইচ্ছেয় বিয়েটা হয়েছিল?' চিত্ত অবাক হওয়ার মতন গলার সুর করল।

'না বাবাও চাইছিল না।'

'তা হলে—অ, বুঝতে পেরেছি, মাসিমা, তোমার মা—' বলতে গিয়ে চিত্ত থেমে গেল।

'হ্যাঁ, তা বলতে পার, আমার মা—ভীষণ ছটফট করছিল ডলি, কান্নাকাটিও করছিল, সাংঘাতিক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বিয়ের জন্য, কাজেই মা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে পার, কেবল ডলির মুখের দিকে চেয়ে—'

'মায়ের মন।' চিত্ত অস্ফুট গলায় বলল, তারপর একটু সময় থেমে থাকল। তারপর আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। 'তা হলে ছেলেটি কোথায় এখন, বলছ বরের ফটো খুঁজছে ডলি, চিঠি খুঁজছে, বাক্সের তালা ভাঙতে চাইছে।'

'মনতোষ, হুঁ, ওর বরের নাম ছিল মনতোষ—মনতোষ রায়, সম্ভবত মারা গেছে, ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমাদের বালিগঞ্জের ছেলে!' যেন চিত্ত বড় বেশি চমকে উঠল! 'তাই না?'

'হুঁ, তুমি দেখেছ, বাবার বন্ধু অশ্বিনী রায়ের ছেলে। আমাদের বাড়িতে খুব আসা যাওয়া ছিল ছোঁড়ার।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে যখন মাঝে মাঝে যেতাম, মনতোষকে তোমাদের বাড়িতে দেখেছি, পরিষ্কার মনে পড়ছে এখন। তারপর?'

'তারপর আর কি, তখনই প্রেমের সূত্রপাত।'

'এত টেণ্ডার এজ্‌এ প্রেম!' চিত্ত গলার নিচে হাসল। তার হাসিটার মধ্যে যথেষ্ট করুণা ছিল। 'অশ্বিনী রায়ের ছেলে মনতোষেরই বা এমন কি বয়সটা ছিল!'

'আর বয়েস!' অমূল্যর গলায় কিছুটা তিক্ততা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল। 'যা দিনকাল পড়েছে, মায়ের দুধ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েরা এখন টুপটাপ প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি, আমরা কত বড় হয়ে গিয়েও—যাক গে, মনতোষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না অর্থ কি?' চিত্ত প্রশ্ন করল।

'অশ্বিনীবাবুর ছেলে নেভীতে ছিল, তুমি নিশ্চয় শুনেছিলে।' অমূল্য সামান্য কাশল।

'হুঁ, তা শুনেছিলাম, তারপর?'

'রেড-সীতে ওদের জাহাজ ডুবে যায়।'

'সেটা কবে?'

'ডলি ও মনতোষের বিয়ের ঠিক এক বছর পর।' অমূল্য একটা ভারি নিশ্বাস ফেলল।

চিত্ত চুপ।

'সতেরো জনের ডেড-বডি ওরা খুঁজে পেয়েছিল শোনা যায়। বাকি তেরো জনের কোন সন্ধান মেলে নি।' অমূল্য মোড়া থেকে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল। যেন অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে তার পা ধরে গেছে।

'তারাও নিশ্চয় বেঁচে ছিল না!' অস্পষ্ট উদ্বিগ্ন গলায় চিত্ত বলল, 'মানে যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি বললে?'

'হুঁ, তা আর বলতে', অমূল্য আস্তে বলল, 'কিন্তু ডেড-বডি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সরকারীভাবে তো সেটা ঘোষণা করা যায় না। ওরাও করে নি। আমাদের মনতোষ সেই নিখোঁজ নৌ-সৈন্যদের একজন।'

'স্যাড্।' চিত্ত একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

ঝিঁঝির ডাক তখন কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত হয়েছে। অল্প অল্প বাতাস বইছিল। বাইরে গাছপালার মৃদু সর-সর শব্দ শোনা গেল। 'ডলি কী বলছে?' প্রশ্নটা করেই চিত্ত থমকে গেল। যেন তার

নিজের কানেও কথাটা বেখাপ্পা শোনাল। লজ্জিত হল সে। অমূল্য অবশ্য সেটা গায়ে মাখল না।

'কি আর বলবে, গোড়ায় কদিন আমাদের মনেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল, কি জানি, হয়তো মনতোষ বেঁচে আছে, হয়তো সাঁতার কেটে বা একটা বয়াটয়া আশ্রয় করে কোথাও কোন ডাঙ্গায় গিয়ে উঠতে পেরেছিল, ঈশ্বরের হাত, নৌকাডুবি জাহাজডুবির দুর্ঘটনা পৃথিবীতে কতই তো ঘটে, কত লোক সঙ্গে সঙ্গে জলের নিচে তলিয়ে যায়, আবার শেষ পর্যন্ত কিছু মানুষ যেমন করে হোক বরাত জোরে বেঁচে যায়।'

চিত্ত কথা বলছিল না।

'তবে সেই আশা নিয়ে ক'দিন—ক'মাস মানুষ বসে থাকে বলো?' অমূল্য আর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'আজ পাঁচ বছর—মনতোষ যে আর কোনদিনই ফিরে আসবে না, বেঁচে নেই সে, এই সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। কিন্তু আমার বোন ডলিকে একথা বলে বোঝান যায় না, কোনদিন যাবে না। ওর এখনো ধারণা মনতোষ ঠিক এসে যাবে, আজ যখন এলো না, কাল আসবে, কাল যদি না আসে পরশু —এভাবে দিনের পর দিন যাচ্ছে, মাসের পর মাস যাচ্ছে, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে—'

'ওফ্, খুবই মর্মান্তিক—' চিত্ত আক্ষেপের সুরে বলল।

'এখন বলতে পার, মাথাটা ওর একরকম খারাপই হয়ে গেছে—মনতোষের লেখা দুটো চিঠি ও একটা ফটো ছিল ওর ট্রাঙ্কে। এমন দিন গেছে, হাজারবার চিঠি দুটো পড়ত, হাজারবার মনতোষের ফটোটা বাক্স থেকে বের করে চোখের সামনে ধরে হাউমাউ করে কাঁদত। আমি সেগুলো সরিয়ে ফেলেছি। কেননা দেখতাম, ওসব দেখে ওর অস্থিরতা—কেবল অস্থিরতা বলি কেন, পাগলামি বেড়ে যেত। জামির লেনে থাকতেই পাগলামির লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছিল—ওর একটা ধারণা, যেহেতু আমি ও বাবা ওর এই বিয়ের

পক্ষপাতী ছিলাম না, খুব আপত্তি টাপত্তি করেছিলাম দুজনে, তাই আমি ও বাবা চক্রান্ত করে মনতোষকে বুঝি কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, ওর সামনে আসতে দিচ্ছি না। যেজন্য বাবাকে আমাকে—আমাকেই বেশি রাতদিন গালিগালাজ করছে।'

'ইস্, তোমার মা-র আজ বেঁচে থাকার খুব প্রয়োজন ছিল।' চিত্ত না বলে পারল না। একটু থেমে থেকে আবার বলল, 'ওর বাক্স থেকে তুমি যে চিঠি ও ফটোটা সরিয়ে ফেলেছ ডলি নিশ্চয় জানে না।'

'জানলে আর রক্ষে ছিল? আমি বাড়িতেই থাকতে পারতাম না। বলেছি, তোর ট্রাঙ্কে আছে খুঁজে ছাখ্,—ট্রাঙ্কের চাবিটা অবিশ্যি আমি সরিয়ে রেখেছি।'

'ভাল করেছ, তা না হলে ট্রাঙ্ক খুলে যখন দেখত—হুঁ, এ ছাড়া আর উপায় কি, কিন্তু বাক্সের চাবি খুঁজে পাচ্ছে না বলে তোমাকে বা মেসোমশায়কে তো ও সন্দেহ করছে না?'

'হুঁ, তা তো করছেই সময় সময়—আমরা বলি তুই নিশ্চয় কোথায় রেখেছিস চাবি, মনে করতে পারছিস না, আমরা তোর চাবি দেখিনি, কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছিস ভাল করে খুঁজে পেতে ছাখ্।' অমূল্য ক্ষোভের গলায় হাসল।

'ঐ শোন, আবার খটমট আওয়াজ করছে।' চিত্ত দু কান খাড়া করে ধরল।

'হুঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই এই চলছে। চাবি খুঁজে পাচ্ছে না। তালা ভাঙতে চাইছে—চুলের কাঁটা, সেফটিপিন ঢুকিয়ে তালাটা খুলতে কম চেষ্টা করছে না।'

'আহা, বড় কষ্ট লাগে!' বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে চিত্ত বলল, 'কিছুতেই ও ভুলতে পারছে না মনতোষকে—লভ্ ম্যারেজের কতগুলো দোষও আছে।'

'কাজেই ছাখো, কী অশান্তির আগুনে আমি আছি, নিজের কথা যে ওদের বলব, কখন বলতাম বলো? আমার এত বছরের জীবনে

নিজের সুখ-দুঃখের কথা জানাবার সুযোগই পেলাম না এই পরিবারের কাউকে। সময় হবার আগেই মা চলে গেল, বাবা অসুস্থ অকর্মণ্য। ছোট্‌কা? তুমি যদি ওকে দেখতে। হুঁ গোঁফদাড়ি ওঠার বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পাঁচ বছরের একটি শিশুর বুদ্ধি ওর হয় নি, তার ওপর চুল বড় রাখছে, গায়ে নোংরা জামা কাপড়, ইডিয়টের মতন বন-বাদাড়ে সারাদিন ঘুরছে—ইডিয়টই বলতে পার, এই জীবনে একটা পয়সা ও রোজগার করতে পারবে না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি, বাবাকেও সেকথা বলেছি। ওর চেহারাটাই এমন ভোঁতা, কেউ ওকে পছন্দ করবে না, কোথাও কাজে ঢুকলে কাজ করতে পারবে না, আশে-পাশে যারা থাকবে তারাই ওকে কিছু করতে দেবে না, পদে পদে ভুলত্রুটি ধরবে, নয়তো কথায় কথায় ঠাট্টা করবে অপদস্থ করবে বা চুরিটুরির অপবাদ দিয়ে একদিন তাড়িয়ে দেবে। এক-একটা মানুষ এমন দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মায়—যাদের কেউ সহ্য করে না, তাদের দোষ থাক না-থাক্। আমার ভাই ছোট্‌কা তাদের একটি। কাজেই বুঝতে পারছ, সারাজীবন ঐ ছেলে আমার গলগ্রহ হয়ে থাকবে। গেল ভাইয়ের দিক—রইল বোন, ডলি। এতক্ষণ ওর কথা তোমাকে বলেছি।' একটানা এতগুলি কথা বলে অমূল্য যেন হাঁপিয়ে পড়ল বলে চিত্তর মনে হল।

কিন্তু অমূল্য সেখানেই থামল না। 'কাজেই আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে, নয়তো যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে হবে—এভাবে এতগুলো রক্তশোষকের মাঝখানে আমি বাঁচতে পারব না। বাঁচা সম্ভব নয় তুমি এখন বুঝতে পারছ।'

অন্ধকারে চিত্ত ঘাড় নাড়ল।

'ডলিই দেখছি এখানে মেন্ ফ্যাক্টর। তোমার বাবা আর ক'দিন। ছোট্‌কাও ব্যাটাছেলে। তুমি যদি তাকে রাস্তায়ও দাঁড় করিয়ে কোথাও সরে যাও কেউ কিছু বলবে না—কিন্তু তোমার বোন—'

'আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে চিত্ত, কাঁদতে পারি না। জামির লেনের বাসায় অবস্থাটা কী করে তুলেছিল ওই মেয়ে! রাতদিন চেঁচামেচি হল্লা চিৎকার—আত্মীয়স্বজন তো বটেই, শেষটায় পাড়াপ্রতিবেশীকে ডেকে বলতে আরম্ভ করল—আমরা চক্রান্ত করে মনতোষকে সরিয়ে দিয়েছি, ওর কাছে আসতে দিচ্ছি না, ওরা দুজন সুখী হোক আমরা চাই না, আমি না, বাবা না। অবিশ্যি পাগলের প্রলাপ, সবাই বুঝত, কিন্তু তা হলেও পরিচিত সব মানুষের চোখের দিকে তাকাতে আমাদের যেন কেমন লজ্জা করত। ওর নিয়তি ওকে এমন করেছে—কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল এর জন্য আমরাই বুঝি দায়ী। আমরাই অপরাধী। যেজন্য বাবাকে বলে জামির লেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি ওদের নিয়ে এখানে চলে এলাম। আসতে বাধ্য হয়েছি। তা না হলে এসব জায়গায় কোনো ভদ্রলোক থাকে? রোজ যাকে কলকাতায় অফিস করতে ছুটতে হয়। ডেইলী প্যাসেঞ্জারের জীবন কী দুর্বিষহ—বিশেষ করে আজকাল।'

অমূল্য চুপ করল। বাইরে হরলালের গলা শোনা গেল। একটা জোনাকি জানালা দিয়ে কখন ভিতরে ঢুকে পড়ে এই দেওয়াল থেকে উড়ে ওই দেওয়ালের দিকে যাচ্ছে। নীলাভ সবুজ আলোর ফুটকি। একবার জ্বলছে, একবার নিবছে।

'আজ আমি উঠব অমূল্য।' চিত্ত গাঢ়স্বরে বলল, 'আটটা চল্লিশের একটা ট্রেন আছে, আসবার সময় স্টেশনে আমি খবর নিয়ে এসেছি। আর একদিন আসব।'

॥ পাঁচ ॥

অমূল্য ঘাড় গুঁজে ভাত খাচ্ছে। হরলাল সামনে বসে ছেলের খাওয়া দেখছে। একটু আগে, চিত্ত চলে যাওয়ার মিনিট দশেক পরেই ডলি এমন চিৎকার আরম্ভ করেছিল, হরলাল তৎক্ষণাৎ ছোট ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য হরলাল তার আগেও বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিল ছোট ছেলে ছোট্কাকে খুঁজতে গিয়ে।

সেই জঙ্গলের কাছে ইটের পাঁজার কাছে অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে উল্লুকটা কি করছিল?

'তুই কি মানুষ না ভূতপ্রেত? এমন সৃষ্টিছাড়া চালচলন। দিনদিনই এটা বাড়ছে—তুই মনে মনে কি চাইছিস বল্ তো? না, এভাবে সংসারের বোঝা হয়ে থাকবি না। ভাতের খরচ চালাতে অমূল্যর কষ্ট হয়। সারাদিন বেচারা মুখ বুজে খাটছে। কিছু বলছে না। কিন্তু তারও একটা সহ্যসীমা আছে। গরু ছাগলের মতন উদ্দেশ্যহীন হয়ে তুই বনবাদাড়ে ঘাটে মাঠে সারাদিন ঘুরবি আর সময় বুঝে ঘরে ঢুকে থালা ভরতি ভাত খাবি—আর এক ছোঁড়া কেবল খেটে মরবে—এতটা অবিচার আমি কিছুতেই সহ্য করব না, অনেক সহ্য করেছি—কাজ কর্মে মন নেই, কিভাবে দুটো পয়সা ঘরে আনা যায়, দাদাকে সাহায্য করা যায়—সেদিকে খেয়াল নেই, কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান—দরকার কি এই সংসারে থেকে ভিড় বাড়ানোর, যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যা তুই—আমি একটুও দুঃখ করব না।'

ছোট্কাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হরলাল সারা রাস্তা এভাবে বকাবকি করছিল। ছোট্কা একটাও কথা বলেনি। যেন

বাবার সব কথা কানেও তুলছিল না। রাত্রের বাতাসে কোথায় কামিনী ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে। জোর শ্বাস টেনে গন্ধটা নিচ্ছিল।

ছেলের এই উদাসীনতা অন্যমনস্কতা ও নিরাসক্ত ধরনধারণ হরলালকে আরও বেশি তাতিয়ে দিচ্ছিল।

'অ্যাঁ, তোর শরীরে তাপ নেই, ঘেন্নাপিত্তি লজ্জা বলেও কিছু নেই। যেমন অজবুকের মতন চেহারাটা করেছিস, তেমনি তোর ভেতরটা—এত গালাগাল খেয়ে বকাঝকা শুনে যদি চেতনা না হয়, ওফ্, কেন যে এমন অপদার্থের আমি জন্ম দিয়েছিলাম।'

কিন্তু উঠোনে পা দিয়ে হরলাল একেবারে চুপ। চিত্তকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অমূল্য জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়েছে। এখন তাকে ভাত খেতে দিতে হবে। এখন আর উচ্চবাচ্য নয়। শুনলে অমূল্যও উত্তেজিত হবে। তখন মুস্কিল আছে। খাবে না সে।

অমূল্যর জন্য ঠাঁই করে দিয়ে গেলাসে জল গড়াতে যাচ্ছিল হরলাল। এমন সময় ডলির চিৎকার। হরলাল তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। তৎক্ষণাৎ মেয়ের ঘরের দরজাটার কাছে ছুটে গেছে। দরজায় জোরে একটা ধাক্কা দিয়েছে। 'খোল, খোল, দরজা। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

'আমার ট্রাঙ্কের চাবি কোথায়? চাবি বের করে দাও শিগ্‌গির, তোমরা চাবি লুকিয়েছ।' ডলি অনর্গল চিৎকার করছিল। 'চাবি বের করে না দিলে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আমি পুড়ে মরব।'

খাবার ঘরে যাবার পথে অমূল্য কথাগুলো শোনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বাবাকে ডাকে, 'এদিকে চলে এস তুমি, ওখানে ছুটে গেছ কেন! লো প্রেসারে ভুগছ, এ তো নতুন কিছু নয়—খামকা তুমি উত্তেজিত হবে, শরীর খারাপ করবে। এসো আমায় খেতে দেবে।'

আর কথা বলে নি হরলাল। অমূল্যর ডাক শুনে ঘাড় নীচু করে

খাবার ঘরে চলে এসেছে। অমূল্যকে ভাত বেড়ে দিয়েছে। বস্তুত এইমাত্র অমূল্য যদি না ডাকত, কী যে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলত সে আজ। অমূল্যর খাওয়া দেখতে দেখতে হরলাল চিন্তা করছিল।

'চিত্তকে একটু চা-টা খেতে দেওয়া হল না।' ডলির চিন্তা ছেড়ে দিয়ে হরলাল চিত্তর প্রসঙ্গে চলে এল।

'কে চা করে দিত, তুমি করতে?' ভাতের থালা থেকে অমূল্য মুখ তুলল। 'দরকার নেই, চিত্ত কিছু নতুন মানুষ নয়। আমাদের ওপাড়ার ছেলে, চা দেওয়া হল না বলে কিছু মনে করবে না।'

'না, তা করবে না।' হরলাল বিড় বিড় করে উঠল। 'তা হলেও তো কতদিন পর দেখা।'

অমূল্য আলু ভেঙ্গে মুখে পুরছিল। নিরামিষ রান্না। 'আজ মাইনে পেয়েছি, কাল সকালে ছোট্‌কাকে বাজারে পাঠিয়ে একটু মাছটাছ আনাবে।'

'আনাব বৈকি। দুদিন ধরে নিরামিষ খাচ্ছিস।' হরলাল ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আজ ভেবেছিলাম অন্তত তোর জন্য একটা হাঁসের ডিম রান্না করব। পাড়ার মুদি দোকানটায় তখন ছোট্‌কাকে পাঠিয়েছিলাম। ডিম ফুরিয়ে গেছে। থাকলে ধারে তোর জন্য একটা ডিম আনা যেত। কেবল তোর জন্যই আনাতাম।'

'থাক, মুদি দোকানে ধারটার বেশি কোরো না। সব তো আবার আমাকেই শোধ করতে হবে।' অমূল্য জলের গেলাস তুলে ঢকঢক জল খেল। 'চিত্ত বেশ মোটা হয়েছে।'

'হুঁ, মোটা হয়েছে,' খাওয়ার প্রসঙ্গটা অমূল্য নিজের থেকে চাপা দিল বলে হরলাল খুশি হল। 'বিয়েটিয়ে করেছে কি ছোঁড়া?' হরলাল সামান্য হেসে প্রশ্ন করল।

'না। বড়লোকের ছেলে। বোম্বেতে আছে। তাও আবার সিনেমার লাইন। অন্য মেজাজ নিয়ে আছে সে। আমার মতন নটা পাঁচটা অফিস করছে না।'

অমূল্য হাত থেকে জলের গেলাসটা নামিয়ে রাখল। ঠক্ করে একটা শব্দ হল বলে হরলালের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। অনেক সময় রাগ করে অমূল্য এভাবে শব্দ করে হাতের গেলাস বাটি নিচে নামিয়ে রাখে। মুখে অবশ্য রাগটা প্রকাশ পায় না, তা হলেও হরলাল ছেলের মুখ দেখে একটু আধটু টের পায়।

সেজন্য চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে মনোযোগ দিয়ে অমূল্যর চোখদুটো এখন দেখে নিল সে। অস্বাভাবিক কি, হরলাল চিন্তা করল। চিত্তর সঙ্গে নিজের ভাগ্য তুলনা করতে গিয়ে অমূল্য যদি ভিতরে ভিতরে রুষ্ট হয়, দুঃখ পায় তো তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি!

না, ছেলের চোখ দেখে হরলাল নিশ্চিন্ত হল। অমূল্য মুখ টিপে হাসছে। সে-সব কিছু ভাবছে না বোঝা গেল।

'হাসছিস্ বড়?' হরলাল হালকা গলায় প্রশ্ন করল।

'চিত্তর কথা ভেবে,' গেলাস তুলে অমূল্য আবার এক চোক জল খেল।

'কেন কি হয়েছে?'

'তোমরা টের পেতে না, তুমি না, মা-ও না। আমি টের পেতাম। জামির লেনের বাসায় চিত্ত খুব বেশি আসত, তার কারণ ডলি। ডলির জন্য ভেতরে ভেতরে তার একটা ভয়ানক দুর্বলতা ছিল।'

'তাই নাকি! ডলি টের পেত?'

'মনে হয় না। তাছাড়া ডলির চিন্তা-ভাবনায় তখন মনতোষ ছাড়া আর কেউ ছিল না যে, অন্য কোনদিকে তার খেয়ালই ছিল না।'

'হুঁ, তাও বটে!' হরলাল মাথা ঝাঁকাল। 'আজ তোর সঙ্গে চিত্তর কি নিয়ে কথা হচ্ছিল—এখনো কি চিত্তর সেই দুর্বলতাটা আছে বুঝলি?'

'মনে হয় আছে। ডলির সব কিছুই মন দিয়ে শুনল। শুনে খুব দুঃখ পেল।'

একটু থেমে অমূল্য আবার বলল, 'অবশ্য এখন দুর্বলতা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি, এখন তো আর ডলি নর্মাল অবস্থায় নেই। চিত্তকে তা-ও বললাম। মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে ওর।'

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে হরলাল একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলল— 'হুঁ, মানুষের ওপর দেখে, বাইরের চেহারা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না। আমি কিন্তু একদিনও তোর ওই বন্ধু চিত্তকে দেখে জিনিসটা টের পেতাম না। বেঁচে থাকতে তোর মা-ও যেন বুঝতে পারে নি।'

'আমি খুব টের পেতাম,' অমূল্য গলায় শব্দ করে সামান্য হাসল। 'ডলির জন্য চিত্ত ভীষণ ছটফট করছিল। দিনে দুবার তিনবার তখন আমাদের বাড়ি এসেছে সে, দেখনি ?'

'হুঁ, এখন মনে পড়ছে। তারপর কিন্তু দেখতাম ছোঁড়া হঠাৎ যেন আসাযাওয়া একদম বন্ধ করে দিল।'

'ঐ যে মনতোষের আনাগোনা আরম্ভ হল, বোম্বে চলে গেল চিত্ত। আমি তখনই টের পেয়েছিলাম। একটু আঘাত পেয়েই কলকাতা ছেড়ে চলে গেল সে। তবে কিনা—'

অমূল্যর যেটা কু-অভ্যাস, গেলাসের ভিতর হাত ঢুকিয়ে হাত ধুতে লাগল। হরলাল এটা মোটেই পছন্দ করে না। তবে বিরক্তিটা মুখে কোনদিন প্রকাশও করে না সে। যে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, যে এই সংসারের হাল ধরে আছে, তার চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে যদি একটু আধটু দোষত্রুটি তোমার চোখে পড়ে চোখ বুজে তোমাকে সহ্য করতেই হবে। হরলাল অনেকদিন নিজেকে বুঝিয়েছে।

'হুঁ, কি বলছিলি ?' অমূল্যর হাতের দিকে না তাকিয়ে হরলাল তার চোখদুটো দেখল।

'তবে কিনা,' তেমনি হাসিহাসি মুখে অমূল্য বলল, 'চিত্তর বোম্বে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ডলি ও মনতোষের বিয়ে হয়ে যাবে, এতটা সে বুঝতে পারে নি। তারপর বিয়ের এক বছর না ঘুরতে এমন এক দুর্ঘটনা!'

'মানে চিত্ত ভেবেছিল বোম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে এসেও দেখবে ডলির এখনো বিয়ে হয় নি, মনতোষ এ বাড়ি আসা-যাওয়া করছে—এই পর্যন্ত, বা হয়তো যে-কোন কারণে মনতোষের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়েও যেতে পারে, তাই না !'

'আমার মনে হয় এমন একটা আশাই করেছিল চিত্ত। যে জন্য ওদের বিয়ের কথা শুনে খুবই অবাক হল সে, বার বার একটা কথা বলল, একেবারে টেণ্ডার-এজ, এত কম বয়সে ডলির বিয়ে হয়ে গেল ! ভারি আশ্চর্য তো !'

'হুঁ,' হরলাল ঘাড় নাড়ল, 'আজকের দিন বলে জিনিসটা আশ্চর্য ঠেকছে—যেখানে ত্রিশ বত্রিশ পার হয়ে যায়, মেয়েরা বিয়ে করে না, বা বাপ-কাকা পাত্র জুটিয়ে বিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায় না। তা তো বটেই, সেখানে ষোল না পুরতেই ডলির বিয়ে হল, চিত্তর চোখে জিনিসটা অস্বাভাবিক ঠেকবে জানা কথা।'

একটু থেমে থেকে হরলাল আবার ছেলের চোখের দিকে তাকাল। 'আবার কবে আসবে চিত্ত বলে গেল কিছু ?'

'বলে যায় নি, তবে আসবে, যে-কোনদিন আসতে পারে, কলকাতায় এখন কিছুকাল থাকবে সে—কাজেই বুঝতে পারছ···'

অমূল্য একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে খাবার আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। হরলাল গম্ভীর হয়ে রইল।

'তোমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।' অমূল্য শোবার ঘরের দিকে চলল।

'আমি তোর বিছানা করে, মশারী টাঙ্গিয়ে দিয়েছি।' পিছন থেকে হরলাল বলল। অমূল্য শব্দ করল না।

রান্নাঘরের চালটা টিনের। ওধার থেকে আমগাছের বড় বড় ডাল এসে চালে ঠেকেছে। যে জন্য সামান্য বাতাস বইতে থাকলেও ডালগুলি যখন নড়ে, চালের গায়ে বাড়ি খেয়ে ঠনঠন শব্দ করে, বিশ্রী

আওয়াজ! প্রথম প্রথম তো হরলাল ঘুমোতেই পারত না ওই আওয়াজ শুনে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

আজ মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর হরলাল টের পেল বাতাস বন্ধ। কেমন একটা ক্লান্তিকর গুমোট নিয়ে প্রকৃতি ধুঁকছে। চালের ওপর গাছের ডাল নড়া দূরে থাক, একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

কান-মাথা গরম হয়ে গেছে বলে হরলাল এইমাত্র বাইরে একটু পায়চারি করেও এসেছে। তাও কিছু ফল হয় নি।

কিছু পুরানো জামা-কাপড় নিয়ে ঘরের কোণায় একটা বেতের ঝুড়ি পড়ে আছে। সেই জামির লেনের বাড়িতেও ওটা ছিল। ফেলে দিলেও কিছু ক্ষতি হয় না এমন সব জিনিস। কিন্তু ফেলা আর হল কোথায়! আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে ঝুড়িটাও এখানে চলে এসেছে।

জামির লেনে যেমন ইঁদুর ঢুকে কুটকুট শব্দ করে ঝুড়ির ভিতর কি সব দাঁত দিয়ে কাটত, এখানেও তাই হচ্ছে। কুটকুট করে সারাক্ষণ কিছু কাটছে। যেন জামির লেনের ইঁদুরগুলো এখানে চলে এসেছে। তাদের বংশবৃধি হয়েছে জানা কথা। শব্দের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ঝুড়ির ভিতর দৌড়ঝাঁপও বেড়েছে।

হরলাল এসব শুনছিল। আর কান খাড়া করে রাখছিল পাশের ঘরে অন্য আর একটা শব্দ শুনতে।

কিন্তু আর যেন ডলি বাক্সের তালা নেড়ে খটখট আওয়াজ করছে না।

সন্ধ্যার দিকেই যা করেছিল। অথচ আজই এ-বাড়িতে চিত্ত এল। সন্ধ্যার দিকে আজ চেঁচামেচিটাও করেছিল বেশি। অন্যদিন এতটা করে না।

ভাবনার এই জায়গায় পৌঁছে হরলালের কপালের চামড়া কুঁচকে গেল। চট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল।

ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, হরলাল গভীরভাবে এখন জিনিসটার

এপিঠ-ওপিঠ দেখতে চাইছে এবং সেভাবেই চিন্তাটা চালিয়ে যেতে লাগল: বোম্বে থেকে চিত্ত অনুমান করে এসেছিল ডলির আজও বিয়ে হয় নি, তার চেহারা দেখে যা কোনদিন বোঝা যায় নি, অমূল্য আজ যেমন বলছে, ডলি সম্পর্কে চিত্তর নাকি খুবই দুর্বলতা ছিল। আজ হঠাৎ এসে সে জানতে পারল ডলি বিবাহিতা। কেবল তাই না। ডলির স্বামী মৃত অথবা নিখোঁজ। ডলি অবশ্য এর কোনটাই বিশ্বাস করে না। তবে দীর্ঘদিন মনতোষকে দেখতে না পেয়ে সে এখন উন্মাদপ্রায়। এই অবস্থায় চিত্তর মনের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে? অমূল্যর মুখে সে সবই শুনে গেছে।

বিড়িটা জোরে জোরে টেনে হরলাল মগজের ভিতরটাকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্বচ্ছ কোনো চিন্তাই তার মাথায় এল না। সবই কেমন ঘোলা-ঘোলা হয়ে যাচ্ছে সে টের পাচ্ছিল। তাই তো, মানুষের মন বোঝা মুস্কিল।

একটা বিড়ি শেষ করে হরলাল আর একটা বিড়ি ধরায়।

সেটাও টেনে টেনে হরলাল সুতো পর্যন্ত নিয়ে এল, তারপর জ্বলন্ত টুকরোটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে কুঁজো থেকে গেলাস ভরতি করে জল নিয়ে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে ফেলল। তারপর শয্যা নিল। ঘুম নেই।

হরলালের মনে হল চালের ওপর আমের ডালপালা এত বেশি নীরব অনড় হয়ে আছে বলে তার চোখে ঘুম আসছে না। ডলিও আজ আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। যেন এটাও হরলালের অনিদ্রার আর একটা কারণ হয়ে দাঁড়াল।

॥ ছয় ॥

তেমনি ঘুম ছিল না আর একটি চোখে। ছোট্কার। বিছানায় শুয়ে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছিল। বাবার বিছানার পাশেই তার বিছানা। রাত্রে এ বাড়িতে কত রকম শব্দ হয় তার জানা নেই। চোখে কুম্ভকর্ণের ঘুম নিয়ে সে শয্যা নেয়, আর জাগে সেই রৌদ্র উঠলে। আজ জেগে থেকে বেতের ঝুড়ির মধ্যে ইঁদুরের দৌড়-ঝাঁপ ও খুটখুট কাটাকাটির শব্দ শুনল, হরলালের কাশি শুনল, দোর খুলে হরলালের বেরিয়ে যাওয়া ও একটু পরে আবার ঘরে ঢুকে খিল আঁটার শব্দ শুনল। দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে কবারই কাঠি ঘষার শব্দ শুনল, আর শুনল বাবার লম্বা লম্বা শ্বাস। ঘুমের মধ্যে হরলাল এক ধরনের শ্বাস ফেলে, জেগে থেকে আর এক রকম। আজ ছোট্কা বুড়োর দু রকমের শ্বাস শুনল।

এসব শুনতে শুনতে তার বেদম হাসি পাচ্ছিল। দাদাকে যখন বুড়ো ভাত বেড়ে দেয় ছোট্কা বাইরে দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করে। রাত্রে দাদা ভাত খেয়ে উঠে গেলে তবে সে খেতে বসে। এটাই নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। দিনের বেলায় অবশ্য দাদার খাওয়ার অপেক্ষায় তাকে বসে থাকতে হয় না। অমূল্য সেই সকালে পৌনে আটটায় ভাত খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়, আর ছোট্কার খেতে খেতে বেলা বাজে একটা দেড়টা। কোনদিন পৌনে দুটো।

আজ সে চুপচাপ অপেক্ষা করছিল অন্য কারণে। আজ বুড়োর কাছে সে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল।

কী উপায় হত, শোভা যখন তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, কানের কাছে মুখ নিয়ে বিয়েটিয়ে নিয়ে কথা বলছিল, আর ঠিক সেই সময়টায় যদি হরলাল গিয়ে সেখানে হাজির হত? অন্ধকারে চট

করে সব দেখতে পেত না ঠিকই, তা হলেও আবছা অস্পষ্ট দুটো মূর্তি যে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে হরলালের এটা অন্তত চোখে পড়ত। বাব্বা—বরাত জোরে তারা বেঁচে গেছে—তার কাঁধ দুটো ছেড়ে দিয়ে শোভা মাত্র এক মিনিট আগে ঝোপের ওদিকটায় সরে গিয়েছিল।

এই জন্যই বাড়ি ফিরে ছোট্‌কা বাইরে দাওয়ায় বসে কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করছিল, তার সম্পর্কে বাবা কী বলে শুনতে। তার সম্পর্কে কিন্তু কোনো কথাই হল না। সব ছোড়দিকে নিয়ে, ছোড়দির নিখোঁজ বরকে নিয়ে ও বাকি সব কথা জামির লেনের চিত্তদাকে নিয়ে। মানুষের মুখ দেখে তার ভিতর বোঝা কঠিন। দাদা বলছিল চিত্তদাকে দেখে কোনদিন বোঝা যায় নি যে সে ছোড়দির জন্য ছটফট করছে।

জেগে বিছানায় শুয়ে ছোট্‌কা এই জন্যই নিজের মনে হাসল।

চিত্তদা তো বাইরের লোক। এই যে বাবা কি দাদা রাতদিন তাকে চোখের উপর দেখছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তারা কি ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টের পাবে যে ছোট্‌কার ওপরের চেহারাটা আসল চেহারা নয়। তার ওপরটা দেখতে বেজায় বোকাসোকা, ভোঁতা-ভাঁতা, যে জন্য বাবা বলছে উল্লুক, দাদা বলছে ইডিয়ট। অর্থাৎ ডান বলতে সে বাঁ চেনে, বাঁ বলতে ডান, সংসারে সব কাজের অযোগ্য। তবু লোকে ছাই ফেলতে একটা ভাঙা কুলো রাখে—কিন্তু তোকে দিয়ে কোন্ কাজটা হবে, কোন্ দরকারটা পূরণ হবে, আমি জানি না—উঠতে বসতে বাবা তাকে গাল দেয়।

দিক। এই জন্য অবশ্য তার মনে দুঃখ নেই। সে নিজে কী তা সে জানে। পাঁচজন তাকে না-ই বা জানল। বরং তার ওপরের এই ভোঁতা বোকাকান্ত চেহারাটা থেকে ভালই হয়েছে। কেউ বুঝতে পারছে না টের পাচ্ছে না, পরনের ময়লা জামা-কাপড়, রুক্ষ চুল,

খসখসে চামড়া, বড় বড় নখ ও হাবাগোবা চাউনি নিয়ে এই ছেলে বুকের ভিতর একটা টকটকে লাল গোলাপ ফুটিয়ে বসে আছে।

এত বুদ্ধি নিয়ে দাদা কিছু করতে পারল? একটা লজ্ঝর অফিসের ঘুপচি কামরার ভিতর বসে সারাজীবন শুধু চিঠি টাইপ করে মরল।

এত বুদ্ধি নিয়ে, বোম্বে-দিল্লী-ঘুরে-আসা চিত্তদা বোকা-বোকা চোখ করে ছোড়দির বিয়ে হয়ে যাওয়ার গল্পই কেবল শুনল। কেবল বিয়ে হওয়া নয়, বরের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ডলির পাগল হওয়ার গল্পও শুনল। এত সাজপোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঝকঝকে শরীর ও বুদ্ধি-ফেটে-পড়া চোখ মুখ নিয়ে চিত্তদা এখন না জানি কী করবে। আফশোষ করবে? আঙুল চুষবে?

আহা, তারা সেই জাদু জানে না। চিত্ত না, অমূল্য না। যদি বুকের ভিতর গোলাপ ফুল ফোটাতে পারত তাদের কাছেও ভোমরা ছুটে আসত।

যা ছোট্কা অতি সহজে পারল। তাকে ইডিয়ট বলো আর অজবুক বলো। আমাকে তোমরা কেউ চিনতে পারছ না বলে আমি খুশি। খুব খুশি।

॥ সাত ॥

হুকোর নৈচে সাফ করার জন্য একটা পুরোনো ভাঙা ছাতার সিক কোথা থেকে জোগাড় করে রেখেছিল হরলাল। জামির লেনের সিকটা জানালার তাকে বা দেওয়ালের কোণায় যখন তখন চোখে পড়ত, এখন আর চোখে পড়ে না। জিনিসটা কি হারিয়ে গেল, না ও-বাড়িতে ফেলে এসেছে হরলাল ঠিক বুঝতে পারে না। সময় সময় সিকটার কথা মনে পড়ে। এখন আর অবশ্য ওটার প্রয়োজনও নেই। এখন সে হুকো টানা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ হিসেব করে দেখা যাচ্ছে মশলার তামাক টিকে ইত্যাদিতে খরচ বেশি পড়ে যায়। তার চেয়ে বিড়িতে কম খরচ। তাছাড়া হুকো টানার মধ্যে একটা আরাম আয়েসের ভাব থাকে, শব্দ-টব্দটাও বেশি হয়—সব মিলিয়ে, কেমন যেন একটা বিলাসিতাই মনে হয়, যে জন্য হরলাল হুকোটা তুলে রেখেছে। নিজে যতদিন উপায় করত ততদিন বিলাসিতা মানাত। এখন ছেলের রোজগারে খাওয়া, ছেলের ওপর সে নির্ভরশীল।

হুকোর নৈচে পরিষ্কার করার লম্বা সিকটা যে অন্য আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে জামির লেনের বাড়ি থেকে লরী চেপে হৃদয়নগর চলে এসেছিল এবং আজ এক বছর ধরে একটা ভাঙা ক্যানেস্তারার ভিতর একটা ছেঁড়া পা-পোষ দুপাটি ছেঁড়া চটি, হরলালের বোলভাঙা একজোড়া খড়ম ও কিছু পুরোনো অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে ছোট খরটায় অর্থাৎ ডলির শোবার ঘরের এক কোণায় পড়ে আছে হরলাল তা লক্ষ্যই করে নি।

আজ দুপুরে আরও দু-একটা সেফ্‌টিপিন বা চুলের কাঁটা খুঁজতে গিয়ে ডলি ক্যানেস্তারার জিনিসগুলি উপুড় করে মেঝেয় ছড়িয়ে

দেয়। তখন ছাতার সিকটা তার চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডলি সেটা তুলে নেয়। ট্রাঙ্কের তালা খুলতে গিয়ে আধ ডজনের ওপর চুলের কাঁটা ও সেফ্‌টিপিন সে নষ্ট করেছে। ভেঙ্গে গেছে বা বেঁকে তুমড়ে এক একটা এমন হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত সেগুলি আর কাজে লাগান গেল না। তালার ছিদ্রের মধ্যে একটাও আর ঢোকানো যাচ্ছিল না। ফলে চাবি-বন্ধ-তালা যেমন তার ট্রাঙ্কে ঝুলছিল ঝুলতে লাগল। একটা তালা ভাঙ্গতে যে পরিমাণ গায়ের জোর দরকার তা ওর ক্ষীণ শরীরে নেই। যে জন্য অনেক সময় ফ্যাল ফ্যাল করে চাবি-বন্ধ-তালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে ভাবতে থাকে—ভারী আশ্চর্য তো, চাবিটা তাহলে গেল কোথায়! অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। কাজেই ওটা যে কেউ লুকিয়েছে, কেউ সরিয়ে ফেলেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যত দিন যাচ্ছিল সন্দেহটা তত বেশি তার মনে শিকড় গাড়ছিল। তাই না আজ এত চেঁচামেচি করছিল সে। বাবা না, ছোট্‌কাও না, দোষ দিতে গিয়ে সকলের কথাই একসঙ্গে সে বলে বটে, কিন্তু তার বদ্ধবিশ্বাস ওটা তার দাদা অমূল্যর কাজ। দাদাই চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করে বার করছে না।

বলে কিনা মনতোষের ছবি দেখতে চাইছে ডলি, চিঠি পড়তে চাইছে—পুরোনো চিঠি আর কত বার পড়বে সে—ফটোর মধ্যে একটা মুখ আর কতবার দেখবে! ওটা দাদার বানানো কথা। আসল ব্যাপারটার ওপর রং বুলোতে চাইছে অমূল্য। সেই আসল ব্যাপারটাই ডলি সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু ট্রাঙ্কের ভিতরটা ভালো করে খুঁজে না দেখা পর্যন্ত ডলি কিছু বলবে না, কাউকে কিছু বলবে না। এতটা পাগল সে নয়। বোকাও নয়।

পাগল! খুব সুন্দর কথা তৈরি করেছে তার দাদা অমূল্য। অমূল্যর মাথা থেকে শব্দটা বেরিয়েছে। আর বেরোনো মাত্র বাবা ও ছোট্‌কা থেকে আরম্ভ করে বালিগঞ্জের পিসিমা, ভবানীপুরের

জেঠু, টালিগঞ্জের ছোটমাসী, তাদের বেহালার মাসতুতো বোনেরা এবং জামির লেনের ডাইনে বাঁয়ে পিছনে যতগুলি বাড়ি ছিল সবগুলি বাড়ির মানুষ, তাদের পুরোনো প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করেছে। পাগল। ডলির মাথা খারাপ। আবোল-তাবোল বকছে ডলি। মনতোষ নেই, মনতোষ নিখোঁজ, তার মানে বাবা ও দাদা মনতোষকে লুকিয়ে রেখেছে—কোথাও সরিয়ে রেখেছে। যে জন্য ইচ্ছে থাকলেও মনতোষ এ বাড়িতে এসে উঁকি দিতে পারছে না।

কী সুন্দর গল্প, কেমন নিখুঁত কাহিনী! দু বছর ধরে ডলি মনতোষের লেখা চিঠিগুলি অনর্গল পড়ছিল আর মনতোষের ফটোটা অবিরাম দেখছিল—দেখে হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। তারপর একদিন যেহেতু ডলির এই কান্নার দৃশ্যটা সহ্য করা যাচ্ছিল না, এত মর্মান্তিক—ছোট্‌কাকে বাবাকে দাদা এভাবে বুঝিয়েছিল না? হুঁ, যে জন্য একদিন দাদা তার ট্রাঙ্ক থেকে চিঠি ও ফটোটা সরিয়ে রাখল। সরাতে বাধ্য হল।

মূল কাহিনী, আসল গল্প যেটা, তার সঙ্গে মনতোষের চিঠি ও ফটোর ঘটনাগুলি কেমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে।

কাজেই লোকের বিশ্বাস আরও বেশি করে দানা বেঁধেছে। আজ চিত্তদা এসেছিল না? চিত্তদার কাছেও নিশ্চয় গল্পটা ঘটা করে বলেছে দাদা। বলবেই। ডলি পাগল। ডলির মাথার ঠিক নেই। 'ডলি এখনও ধরে আছে মনতোষ ফিরে আসবে। ডলির এখনও ধারণা, বুঝেছ চিত্ত, ওর বর বেঁচে আছে। ডলির ধারণা আমরাই, আমি ও বাবা মনতোষকে এখানে আসতে দিচ্ছি না, বাধা দিচ্ছি, আমরা চক্রান্ত করে ডলির বরকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, ডলির সঙ্গে মিলতে দিচ্ছি না—হা-হা।'

পাশের ঘরে দাদার হাসি ডলি শুনেছে। চিত্তদার চেহারা তখন কেমন হয়েছিল সে বলতে পারে না। নিশ্চয়ই দাদাও বলতে পারবে না। হ্যারিকেন নিবে গিয়েছিল। তেলের অভাবে সলতেটা চড়চড়

শব্দ করছিল দুবার। সেই শব্দ ডলির কানে এসেছে। তারপর ঘরময় রাশি রাশি অন্ধকার নিয়ে দাদা অক্লেশে ডলির পাগল হওয়ার গল্প করল। চিত্তদা কান পেতে শুনেছে। অন্ধকারে এইসব গল্প জমে ভালো। মনে গভীর দাগ কাটে।

যাক গে। সিকটা। এককালে বাবা ওটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হুকোর নৈচে সাফ করত। এতকাল পরেও সিকের গায়ে পোড়া তামাকের গন্ধটা লেগে আছে। দুপুরবেলা একলা ঘরে এত হাসি পেয়েছিল তার! থাক গন্ধ। এমন একটা লম্বা শক্ত লোহার শলা মনে মনে খুঁজছিল সে। সেফ্‌টিপিন ভেঙ্গে যায়। চুলের কাঁটা বেঁকে গেছে। এভাবে আধ ডজনের ওপর কাঁটা ও সেফ্‌টিপিন ভেঙ্গেছে, নষ্ট করেছে সে। আজ তালা খোলার ভালো যন্ত্র হাতে এলো।

রাত্রে। দিনের বেলায় সুবিধা হবে না। তা হলেও তখন থেকেই তার হাত নিসপিস করছিল। আজ ঠিক তালা খুলে যাবে। ট্রাঙ্কের ভেতরটা দেখবে সে। ট্রাঙ্কের ভেতরটা দেখতে পাওয়া আর তার দাদা অমূল্যর বুকের ভেতরটা দেখতে পাওয়া এক কথা।

॥ আট ॥

এমন না যে তাদের ঝি চাকর নেই। আছে। তা হলেও ঘরের কাজকর্ম করতে শোভার একবিন্দু আলসেমী নেই। যেন সে ভালই বাসে এটা ওটা করতে। যে জন্য ওর মায়ের চোখে শোভা 'লক্ষ্মী মেয়ে'।

বাপের পয়সা ছিল। বেঁচে থাকলে আর বিয়ের ভাবনা ছিল না এই মেয়ের! কবেই ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিয়ে দিত। এমন যার নাক চোখ, মিষ্টি মুখের ছাঁদ।

এখন গোটা সংসারটা যে ছেলের হাতে, বিল্টুর হাতে। বিল্টুর যেমন মতিগতি।

শোভার মা দুশ্চিন্তায় বাঁচে না।

এই নিয়ে অবশ্য শোভা—মাকে সময় সময় বোঝায়। 'খামকা ভাবছ তুমি, বিয়ের ফুল যেদিন ফুটবে সেদিন ঠিক আমি চলে যাব। ঘরে বসে থাকব না। চিরকাল কিছু মেয়েরা আইবুড়ো হয়ে থাকে না, কোন সংসারেই থাকে না। কত কত গরিব ঘরের মেয়েরও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।'

শুনে শোভার মা একটু ঠাণ্ডা হয়। যেন গলায় জল আসে তার, আর শোভাও তখন মুখ ঘুরিয়ে টিপে-টিপে হাসে। যেন মনে মনে বলে, আমার ফুল ফুটে গেছে, আর দেরি নেই। গালে হাত দিয়ে বসে তুমি বছরের পর বছর আমার জন্য ভাববে—এ আমি হতে দেব না। বিল্টুকে আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি কিনা। স্বার্থপর ছেলে। ও আবার একটা দাদা নাকি! আমি আমার রাস্তা দেখছি।

বা-রে, বিকেলে গা-টা ধুয়ে একটু সেজেগুজে কোন্ মেয়ে না একটু এদিক ওদিক বেড়ায়। আকাশ দেখে, মেঘের রং ফেরা দেখে, আর দেখে ঘরমুখো পাখির ঝাঁক। শহর না যে পার্কে হাঁটবে, সিনেমায়

যাবে কি রেস্টুরেন্টে ঢুকবে। রোদ না পড়তে যেখানে হুই-হাই শেয়াল ডাকতে আরম্ভ করে, ঝিঁঝির বাদ্য আরম্ভ হয়। আর অন্ধকার হতে না হতে জোনাকির মিছিল।

কাজেই দীঘির ধারে, ওদের বাগানের ওপাশটায় সন্ধ্যেবেলা ঘুরেফিরে হাওয়া খাওয়া ছাড়া শোভার আর জায়গা কোথায়! ভাল করে বাতি না জ্বলতে মেয়ে ঘরে ফিরে আসে।

শোভার মা একটুও ভাবে না শোভাকে নিয়ে। একেবারেই নিশ্চিন্ত। সন্দেহের আঁচড়টি মনে লাগার মতন কোন কাজ করলে তো মার চোখদুটো মেয়ের পেছনে পেছনে ছুটতো।

তাছাড়া সারাদিন, সেই ভোর পাঁচটা থেকে মায়ের পাশে পাশে আছে সে। রান্নার কাজ, ঘর গুছোনো, ধোয়ামোছা, কাচাকাচি—শোভাকে কিছু বলতে হয় না, ঝি-চাকরেরা যতটা করলে করল—বাকিটা ঘরের গিন্নী অর্থাৎ শোভার মাকে সারতে হয়। আর মাকে সাহায্য করতে সারাক্ষণ শোভা দুহাত বাড়িয়ে আছে। এমন 'লক্ষ্মী মেয়ে'র দেখা ক'টা সংসারে তুমি পাবে!

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বিল্টুর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা। স্টেশনের ধারে দোকান। অনেক রাত অবধি খদ্দেরের ভিড় থাকে। এ তো আর মুদিখানা বা মনোহারী কি জুতো কাপড়ের দোকান নয় যে, রাত আটটা বাজতে না বাজতে তোমাকে দোকান বন্ধ করতে হবে। চা ও খাবারের দোকান।

কাজেই বিল্টুর ঘরে ফিরতে রোজ রাত দশটা—কোনদিন এগারোটা বেজে যায়। এতটা সময় কি আর বিল্টুর মা জেগে থাকতে পারে। 'তুমি খেয়ে শুয়ে পড়, প্রেসারের রোগী, রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ করবে'—শোভা মাকে একরকম জোর করেই শুইয়ে দেয়। 'আমি আছি কি করতে, আমি দাদাকে খাবারটা বেড়ে দেব।' মাকে বোঝায় ও।

শোভার মা নিশ্চিন্ত হয়ে যা-হোক চারটি খেয়ে নিয়ে বিছানা নেয়।

রাত জাগার অভ্যাস খুবই ছিল একদিন। এখন সন্ধ্যা সাতটা বাজতে এমন হাই উঠতে আরম্ভ করে না। যত বয়স বাড়ছে—এটা বাড়ছে।

মাকে শুইয়ে দিতে পারলে শোভাও নিশ্চিন্ত। বাবা মারা যাবার পর থেকে এক বিছানায় শোয় দুজন। কিন্তু শোভা তো আর তখনই শোবে না।

মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে হ্যারিকেনটা সামনে রেখে সিনেমার বইগুলো উল্টোয়। ছবি দেখে। মার চোখে আলো লাগবে বলে হ্যারিকেনের চিমনির ওপিঠটায় একটা কাগজটাগজ গুঁজে দেয়। ফলে মার বিছানার দিকটা আবছা অন্ধকার হয়ে থাকে। মোটা মানুষ, বিছানায় যখন শোয়, মাকে তখন যেন একটা ধোপার গাঁটরির মতন দেখায়। সিনেমার বইয়ের পাতা ওল্টাবার ফাঁকে ফাঁকে শোভা চোখ তুলে অন্ধকার খাটটার দিকে একবার দুবার তাকায়।

কি মাসেই একটা করে নতুন বইয়ের আমদানি হয় বাড়িতে। সব বিল্টু বাবুর কেনা। অন্য কোন শখ নেই দাদার। বাজে পয়সা খরচ করার ছেলে নয়। পান খায় না, সিগারেট না—এই বয়সের আর পাঁচটা ছেলে মদ গাঁজা কত কি ছাইভস্ম গেলে। কিন্তু শোভা তার দাদাকে দিয়ে সে সব কল্পনাও করতে পারে না। স্বাভাবিক। পয়সাটা এত বেশি চিনে ফেলেছে বিল্টু। শখের মধ্যে মাসে একবার দুবার বারাসত কি বেলঘরিয়ায় গিয়ে সিনেমা দেখে আসে। আসবার সময় হাতে করে একটা বই নিয়ে আসে। তাতে শোভারই লাভ হয়। কোন দিন তো সিনেমায় যায় না, পয়সা খরচ করে দাদা তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে তবেই হয়েছে!

বড় বড় চোখ করে শোভা এক সময় মাকে দেখে, মার নাক ডাকার শব্দটা ক্রমেই গভীর হচ্ছে।

পা টিপে টিপে শোভা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বেরোবার সময় হাত বাড়িয়ে সাবধানে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দেয়। একটু শব্দ না হয়। ঠাণ্ডা বাতাস নাকে মুখে লাগতে খুব আরাম বোধ করে। রাতের

বাতাস এখনই শিশিরে ভিজে উঠেছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দুবার পিছনটা দেখে শোভা ভিতর বাড়ির উঠোনটা পার হয়ে আমবাগানের দিকে এগোয়। তেঁতুলতলায় না পৌঁছন পর্যন্ত দীঘির ওপারের বাড়িটা চোখে পড়বে না, কিন্তু এখন ওবাড়িতে কে কে জেগে আছে, কে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটাই ভাবনার কথা। উহুঁ, সে এত সকাল সকাল কিছুতেই ঘুমোবে না। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে একসময় অস্ফুট গলায় শোভা নিজের মনে বলল, তার দাদা সারাদিন অফিস করে। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছে জানা কথা, বুড়োটিও হয়তো ঘুমিয়েছে। সে ঠিক জেগে থাকবে। কিছুতেই ঘুম আসবে না তার চোখে, আসতে পারে না। যে-কথা না শোভা আজ তাকে শুনিয়ে দিল! রেজিস্ট্রী করে নয়, পুরোত ডেকে মন্ত্র পড়ে নয়, স্রেফ মন দিয়ে। কথাটা শুনে যে খুব চমকে উঠেছিল সে তার শ্বাস ফেলার ধরণ দেখে শোভা টের পায়, তার হাতের তেলো দুটো তখন ঘামছিল, একটু একটু কাঁপছিল। হাতে হাত রেখে শোভা তা-ও টের পেয়েছে। কাজেই সে জেগে থাকবে, রাতভোর জেগে থেকে ওই একটা কথাই ভাববে।

আর তার পাগল বোনটা। শোভা সব শুনেছে। ভালবাসার বিয়ে ওদের। বরটা নিখোঁজ। জাহাজে চাকরি করত। জাহাজডুবি হয়েছিল। তার মানে লোকটা বেঁচে নেই। কিন্তু এখনও নাকি বোনটা ভাবছে স্বামী কবে ফিরে আসবে—এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে আজ একেবারে পাগলই হয়ে গেছে বলা যায়। চব্বিশ ঘণ্টা দোরে খিল এঁটে বসে থাকে। না খাওয়া না স্নান না ঘুম। পাগল যে কোনো সময়ই ঘুমোয় না, শোভা তা জানে। একা একা একটা ঘরে বসে নিজের মনে বক বক করে ছোট্‌কার বোন। এই নিয়ে নাকি তাদের সংসারে খুব অশান্তি যাচ্ছে।

তেঁতুল গাছটার নিচে এসে শোভা থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা পেঁচা ডেকে ওঠে মাথার ওপর। পেঁচার ডাক শুনলে বরাবর তার গা শিরশির করে। অন্য দিন হলে ঠিক ভয় পেত ও। আজ যেন

আর তত ভয় করছিল না। একটা অন্যরকম সাহস এসে গেছে মনে, তাই হয়, তাই হয় কি ?

কিন্তু একলা আমার সাহস থাকলে তো হবে না, আর একজনেরও মনে সাহস থাকা চাই। যেমন ক্যাবলা চেহারার ছেলে, তখন বিয়ের কথাটা বলতেই আরও যেন ঘাবড়ে গেল, বোকা বোকা চোখ করে তেঁতুল গাছের পাতা দেখছিল। অবশ্য ওর ভোঁতা বোকাকান্ত চেহারাটাই শোভাকে টানছে বেশি। তার দাদা বিল্টু তো খুব একজন চালাক চতুর। চোখে মুখে বুদ্ধি ফেটে পড়ে। উহুঁ, শোভা এটাকে বুদ্ধি বলে না। শয়তানী। অতিরিক্ত চালাক হলেই মানুষ শয়তান হয়। স্বার্থপর হিংসুক নির্দয় কঠিন—কী যে তার দাদা না হতে পারে! দরকার নেই এত বুদ্ধি থেকে। তার চেয়ে বোকা হওয়া ঢের ভাল। তাই না শোভা কদিনের মেলামেশাতেই বুঝে গেছে ওই ছেলের মনটা ভীষণ নরম। শিশুর মতন। ভালবাসার জোর পেয়েও ভেতরটা শক্ত হতে দেরি হচ্ছে। হোক। খুব বেশি দেরি হবে না। যেমন করে লেগেছে না শোভা! দুদিনেই ওর মন শক্ত সবল করে তুলবে।

পা পা করে শোভা ইটের পাঁজাটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায়। দীঘির ওপারের বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে, এক ফোঁটা আলো নেই কোথাও। ওদের সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? ভাবতে বিশ্বাস হচ্ছিল না শোভার। ছুটে আসতে গিয়ে চুলটা এলোমেলো হয়ে গেছে। চুলের দিকে মন নেই ওর এখন।

আস্তে আস্তে ওর দু হাত অবশ হয়ে এল। চোখের দীপ্তিটাও কমে গেল। চুল আর ঠিক করা হল না। চিত্রার্পিতের মতন স্থির নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল ও।

বিল্টু! তার দাদা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না শোভা। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কি। আবছা অন্ধকার ভেঙ্গে, শুকনো ঘাসপাতার মচমচ শব্দ করে বিল্টুর পাতলা ছিপছিপে শরীরটা এদিকে এগিয়ে আসছে।

॥ নয় ॥

ইটের পাঁজাটার আড়ালে দাঁড়াল শোভা। কিন্তু ওর নিজের খারাপ লাগল। দরকার কি লুকোবার। এখানে এসেছে ও হাওয়া খেতে।

'এখানে কি করছিস্ তুই ?'

'হাওয়া খাচ্ছি।' যেমন ভেবেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দাদার প্রশ্নের উত্তর করল শোভা। একটু চুপ থেকে পরে ও পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কি করছিলে ?'

বিল্টু কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। হাঁটতে লাগল। শোভাও হাঁটতে থাকে। দুজনেই এখন ঘরে ফিরছে। রাত থমথম করছে।

'ইস্, আমি ভাবতেই পারি না!' শোভা এক সময় কথা বলে উঠল। বোঝা গেল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকার ভাবটা ও কাটিয়ে উঠেছে। 'ভাবতেই পারি না' বলে ও খাটো গলায় হাসল।

'ভাবতে না পারার কি হয়েছে।' বিল্টু গম্ভীর থেকে উত্তর করল। 'সংসারে এমন কিছু ঘটে না যা মানুষ ভাবতে পারে না।'

'হুঁ, তবে কিনা—' শোভা এবার মাঝপথে থেমে গেল।

'বল্ না, বলে ফেল্।' বিল্টু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। অন্ধকারে তার মুখের রেখা বা চোখের রঙ দেখা যায় না। তবে অবয়ব বোঝা যায়। ভাইয়ের মূর্তি বোন দেখছে। বোনের কাঠামো ভাই দেখছে। তারপর আবার হাঁটে দুজন। একটু পরে তারা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ায়। উঠোনের এক কোণা থেকে কুকুরটা ছুটে এসে বিল্টুর গা-ঘেঁষে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

'মা ঘুমিয়ে পড়েছে ?' ফিসফিসে গলায় বিল্টু প্রশ্ন করল।

'অনেকক্ষণ, তোর জন্য সারারাত জেগে থাকবে নাকি ?'

'তুই খেয়েছিস?' বিল্টু আবার প্রশ্ন করল। 'না।' শোভা মাথা নাড়ে।

'তোর জেগে থাকার দরকার ছিল না।' বিল্টু আস্তে উত্তর করল।

শব্দ না করে শোভা সোজাসুজি খাবার ঘরে ঢুকে বিল্টুর জন্য ঠাঁই করে দিল। জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এসে বিল্টু খেতে বসল।

'তখন হাসছিলি কেন?' ভাতের গরাস মুখে তুলে বিল্টু ফের প্রশ্ন করে।

একটা মোটা কালির শিষ নিয়ে কেরাসিনের কুপিটা একভাবে জ্বলছিল। ঘরের ভিতর হাওয়া ঢুকছে না। কাজেই বাতির শিখাটা একটুও নড়ছে না কাঁপছে না। স্থির উজ্জ্বল আলোয় শোভার মুখটা এখন পরিষ্কার দেখা যায়।—দাদার মুখটাও শোভা বেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে।

'তুই রোজ রাত করে যখন বাড়ি ফিরিস ওই বাড়ির জানালাটার কাছে কি খানিকক্ষণ করে দাঁড়াস?' শোভা প্রশ্ন করে।

'তাতে তোর ক্ষতিটা কি।' গরাসটা গিলে ফেলে বিল্টু বোনের চোখ দুটো দেখল। 'তুইও তো যখন তখন ঐ ইটের পাঁজার কাছে ছুটে যাস। ও বাড়ির ক্যাবলা ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর নিশ্চয়ই ভাব হয়েছে। আমি বেশ টের পাই।'

পাল্টা খোঁচা খেয়ে শোভা হঠাৎ কথা বলতে পারল না। কটমট করে ভাইয়ের মুখটা দেখল। কিন্তু তারপরই চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে সুন্দর ঠোঁটটা ছড়িয়ে দিয়ে হাসল। 'তা ওই ছোঁড়ার সঙ্গে আমার না হয় ভাবই হল, কিন্তু তুই কেমন করে ওই পাগল মেয়েটার জানালায় হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলি—আমি তো এখনও আমার দু চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।···অ্যাঁ, এ যে জলে আগুন লাগার মতন ঘটনা রে দাদা!'

'কেন, জলে আগুন লাগবে কেন?' বিল্টু গেলাস তুলে ঢকঢক

করে জল খেল। তারপর গেলাসটা নামিয়ে রেখে বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। 'জলে যদি আগুনই লাগে, আর চোখের সামনে তুই সেটা দেখিস—তা হলে বিশ্বাস না করারই বা আছে কি শুনি?'

ওদের কথাবার্তা খুবই আস্তে হচ্ছিল। কি জানি যদি পাশের ঘরে মা হঠাৎ জেগে ওঠে। মা এসব শোনে বিল্টু চায় না। শোভাও চায় না। এ নিতান্তই তাদের ভাইবোনের মধ্যে কথা, অন্তরঙ্গ আলাপ।

'বুঝলি, জলেও আগুন লাগে, অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারও এই সংসারে ঘটে—অনেক সময় চোখে দেখেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।' কথাটা শেষ করে বিল্টু আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন ভাত খেতে ভুলে যাচ্ছিল সে। শোভার স্থির চোখের পাতা দুটোর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বিল্টু আবার বলল, 'তুই তো জানিস, রেল লাইনের ধার দিয়ে ঘুরে আসতে হলে অনেকটা পথ হাঁটতে হয় আমাকে। এদিক দিয়ে, মানে আমাদের ওই দীঘির পাড় ধরে যদি আসি, একটু জঙ্গলটঙ্গল আছে, সাপ খোপের ভয়ও আছে। তা হলেও সর্টকাট করে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফেরা যায়, দোকান বন্ধ করতে কদিন ধরে বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। যে জন্য আমাদের ওই জঙ্গলের রাস্তা ধরেই আমি রাত্রে এখন বাড়ি ফিরি। পরশু রাত্রে যখন আসছিলাম, দেখি মেয়েটা ওর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাতের ইসারা করে আমাকে ডাকছে। থমকে দাঁড়ালাম। তারপর হাঁটতে লাগলাম। তখনি শুনলাম শিষ দেওয়ার মতন একটা শব্দ করছে ও। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘাড় ফেরাই। দেখি আবার হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে পাগলীটা।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাস হয়ে শোভা শুনছিল।

'গেলাম জানালাটার কাছে, উপায় কি, হ্যারিকেনটা মুখের কাছে তুলে ধরে এমন করুণ চোখে আমাকে ও দেখছিল, কেমন যেন কষ্ট হল।'

'তারপর, কিছু বলল তোকে ?'

'হুঁ, বলল বৈকি। দেখুন, আপনি আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়শী। আপনি ঘোষদের বাড়ির ছেলে আমি জানি, আপনি মাঝে মাঝে এদিক দিয়ে ঘরে ফেরেন। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, কাউকে বলবেন না। বলতে বলতে, দেখলাম মেয়েটার চোখ দুটো কেমন ছলছল করছে। আমি তখন বললাম, কি কথা বলুন, আমাকে কি কিছু করতে হবে ? মেয়েটা তখন জানালার বাইরে চোখ রেখে আমার পেছনের অন্ধকার গাছপালার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।'

'তারপর ?'

'মেয়েটি বলল, আমার ট্রাঙ্কের চাবিটা হারিয়ে গেছে, খুলতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে কোনো চাবিওয়ালাকে দিয়ে আমাকে একটা চাবি তৈরী করিয়ে দিতে পারেন খুব উপকার হয়।'

'ওর ভায়েরা আছে, বাবা আছে, তুই বললি না কেন,' শোভা ভুরু কুঁচকোলো। 'চাবিওয়ালাকে ডেকে ওরাই তো একটা চাবি তৈরী করিয়ে দিতে পারে!'

'হুঁ, বললাম বৈকি, আমি মোটেই সময় পাই না, সারাদিন দোকান নিয়ে ব্যস্ত, বরং একটা চাবিওয়ালাকে আমি আপনাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব, স্টেশনের ওদিকটায় মাঝে মাঝে দু একজন চাবিওয়ালার দেখা পাওয়া যায়। আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মুখটা ভীষণ কালো করে মাথা নাড়ল। উহুঁ, খবরদার এমন কাজ করবেন না। আমার দাদা বাবা ছোটভাই টের পেয়ে যাবে। চাবিওয়ালাকে দিয়ে চাবি তৈরী করানো দূরে থাক, চাবিওয়ালাকে দেখলে তক্ষুনি ওরা তাড়িয়ে দেবে, বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না। বাড়ির কেউ টের না পায় এমনভাবে কাজটা আমাকে সারতে হবে।'

'ওর ট্রাঙ্কের মধ্যে কী আছে তুই জিজ্ঞেস করলি না ?'

'করেছি জিজ্ঞেস, বলছে ওর বরের ফটো আছে, চিঠি আছে, ওর নিজের দু পদ গয়নাও নাকি ওই বাক্সের মধ্যে আছে।'

'ওই তো, চিঠি ফটো করে করে তো ছুঁড়ি পাগল হয়েছে, ওর ছোট ভায়ের মুখে সবই আমি শুনেছি, যে জন্য ওদের দাদা চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি, কিন্তু', বিল্টু আস্তে মাথা ঝাঁকাল, 'মেয়েটির কথাবার্তা শুনে, যতদূর মনে হল, মোটেই ও পাগল নয়। তাছাড়া, আমায় দুবারই বলল ও, জানেন, বাড়ির সবাই আমাকে পাগল করে রেখেছে, বলছে আমার মাথার ঠিক নেই, কিন্তু আমি জানি, আমার মাথা খুব ঠিক আছে, একটুও গোলমাল নেই মাথার।'

'ওই তো!' শোভা ছোট করে হাসল। 'পাগলে কি স্বীকার করতে চায় যে সে পাগল, না তার মাথার গোলমাল আছে? সে মনে করে—সে নিজে সুস্থ আর পৃথিবীর বাকি সব মানুষ পাগল।'

শোভার কথা শুনে বিল্টুর একটু হেসে ফেলা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শোভা দেখল দাদার মুখটা কঠিন হয়ে গেছে। ঘাড় নীচু করে ভাতের ডেলা পাকাচ্ছে। এবং একটু পরে আবার একটা গরাস মুখে তুলে সে যখন বোনের চোখের দিকে তাকাল দাদার চেহারা দেখে শোভার মুখের হাসি নিবে গেল।

'বুঝলি,' বিল্টু বলল, 'মানুষের ওপর দেখে বাইরের চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না।' তার গলার স্বরটা অতিরিক্ত গম্ভীর ছিল। 'পরশু রাত্রে আমি আর খুব একটা বেশি কথা বলি নি মেয়েটির সঙ্গে। আচ্ছা দেখব কোনো চাবিওয়ালাকে বলে একটা চাবি তোমার জন্য তৈরী করিয়ে দেওয়া যায় কিনা। বলে আমি তখনই সেখান থেকে কেটে পড়লাম। কাল সারাদিন আর চাবিটাবির কথা আমার মনেই ছিল না। রাত্রে যখন বাড়ি ফিরছি তেমনি জানালায় দাঁড়িয়ে হাতের ইশারা করে আমাকে সে ডাকল। আমি খুব লজ্জায় পড়ে গেলাম, মনে মনে বিরক্তও হলাম একটু। জানালার

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বন্ধ তালাটার কথাটা তুলল সে। তক্ষুণি আমার মাথায় এল, তাই তো, তালার নমুনা না দেখলে চাবিওয়ালা বুঝবে কি করে কেমন জাতের তালা। হাতে তালা পেলে তবে তো চাবিওয়ালা আর একটা চাবি তৈরী করে দেবে। হেসে বুঝিয়ে তাকে কথাটা আমি বললাম। শুনে কাল আবার মুখটা ও কালো করে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, না সে আর কি করে সম্ভব! আমার ট্রাঙ্কের আলাদা তালা বলে তো কিছু নেই। বাক্সের সঙ্গেই সেটা লাগান। চাবিওয়ালাকে তো আর বাড়িতে ডেকে এনে বাক্সটা দেখান সম্ভব হবে না—শুনে আমি চুপ করে রইলাম। তখন আস্তে আস্তে ও কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে আরও অনেক কিছু বলল। পরশু রাত্রে যা বলতে পারে নি, কাল রাত্রে বাকিটুকু আমাকে বলল ও—'

'কি বলল শুনি?' আবার শোভার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

'বলল, মানুষের ওপরের চেহারা দেখে তার ভেতর বোঝা শক্ত। আমার দাদা অমূল্য তাই। বাইরে থেকে মানুষটাকে একটুও বোঝা যায় না। দাদার ভেতরটা কী সংঘাতিক কঠিন, মনে একটু দয়ামায়া নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে।'

'কি রকম? না এটা ঠিক বলে নি ও।' শোভা কথাটা আমলই দিতে চাইল না। 'আমি যতটা জানি ওর দাদা অমূল্যই তো ওই সংসারটা ধরে রেখেছে। দুটি ভাই বোন ও বুড়ো বাবা ছাড়া কিছু সে জানে না। সারাদিন মুখ বুজে অফিসে খাটছে। মাসের শেষে টাকা এনে বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে, নিজে একখানা ভাল জামা পর্যন্ত গায়ে দেয় না।' একটু থেমে থেকে শোভা আবার বলল, 'স্বার্থপর যদি বলতে হয় তবে তুই—দোকান থেকে যা আয় হয় সবই তুই নিজের জন্য খরচ করছিস, উঁহুঁ, ওদের দাদা অমূল্য অন্য মানুষ। ওর ছোট ভাই আমাকে সব কিছু বলে, ওই সংসারটার জন্য তাদের দাদা অমূল্য না-করতে পারে এমন কাজ

নেই—ভাইবোন সুখে থাকুক বুড়ো বাপ সুখে থাকুক, এই চিন্তা ছাড়া—'

শোভাকে কথাটা শেষ করতে দিল না বিল্টু। 'তুই থাম, নিশ্চয় অমূল্যর বোন তার দাদাকে যত চিনেছে—ছোট ভাইয়ের কথা বলছিস,' বিল্টু ভেঙচি কাটার মতন চেহারা করল, 'ওটাকে একটা পাঁঠা, গাধা উল্লুকও বলা যায়। দু'দিন আগে আমার দোকানে ঢুকে ধারে চা বিস্কুট খেয়ে এসেছে। বলছিল, পয়সাটা পকেটে ছিল, কোথায় যেন পড়ে গেছে—একেবারে মিছে কথা, এমন রাগ হয়েছিল না শুনে—তখনই ভাবলাম দেই দু গালে দু থাপ্পড় বসিয়ে। নিতান্তই পাড়ার ছেলে, বাড়ির সঙ্গে বাড়ি, কিছু আর বললাম না—'

'তোর পয়সা ও দিয়ে দেবে—রাখবে না, পয়সা মেরে দেবার ছেলে সে নয়।' চেহারাটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেলল শোভা।

'না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস কি!' গেলাস তুলে ঢকঢক করে আবার খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বিল্টু বলল, 'তবে ওর দাদাটি যে একটি সাংঘাতিক লোক—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ আরও অনেক কিছু শুনে এলাম মেয়েটির মুখে, আঃ, বড়ো দুঃখের জীবন! ওর স্বামী যে আর বেঁচে নেই, দুর্ঘটনায় মারা গেছে এটা কিন্তু ও বিশ্বাস করে। দু'বছর আগে হয়তো করত না, এখন বিশ্বাস করে। কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা অন্য রকম করে ওর সম্পর্কে রটাচ্ছে, বিশেষ করে ওর ওই দাদাটি—ও নাকি স্বামীকে ভুলতে পারছে না, স্বামী ফিরে আসবে সেই আশায় ও দিন গুনছে, কান্নাকাটি করছে। কেবল তাই না, ও নাকি ফাঁক পেলেই একে ওকে বলছে ওর বাপ ভাইয়েরা ইচ্ছে করে ওর স্বামীকে ওর কাছে আসতে দিচ্ছে না, অর্থাৎ ও যে প্রকৃতিস্থ নয়, মাথার গোলমাল এটা প্রমাণ করার জন্য ওর সম্পর্কে ওর দাদা এই মিথ্যে কথাটা বেশি করে রটাচ্ছে।'

'সত্যি!' শোভার চোখের তারা গোল হয়ে গেল। 'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় পাগল পাগলের মতন কথা

বলছে। নিজের বোন সম্পর্কে এত বড় একটা মিথ্যা কথা রটিয়ে ওর দাদা অমূল্যর লাভটা কি হচ্ছে শুনি?'

'অনেক লাভ হচ্ছে।' বিল্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'ওর নাম ডলি। ডলি চাইছে এখন অন্য জীবন। গান ভালবাসে ও। গানের ইস্কুলে ভর্তি হতে চায়। বা এমনি ইস্কুলে ভর্তি হয়ে নতুন করে লেখাপড়া আরম্ভ করতে। বিয়ের আগে যেভাবে চলছিল। বাইরে বেরোনো। পাঁচটা মানুষের সঙ্গে আবার মেলামেশা করা। কিন্তু অমূল্য কিছুতেই চাইছে না সেসব।'

'কেন?'

'খরচ বাড়ে, বোনকে আবার সেভাবে সাজগোজ করতে দিতে হবে। শাড়ি জামার খরচ আছে তেল সাবানের খরচ আছে। গানের ইস্কুলে ভর্তি হোক বা এমনি ইস্কুলে—তারও আর একটা বাড়তি খরচ অমূল্যকে যোগাতে হবে। অমূল্য এসব ভয় পায়, কাজেই বোনটাকে পাগল করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। আধপেটা খাবে, উপোস থাকবে, একটা বন্ধ ঘরে আটকা থেকে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় পরে দিন কাটাবে—কেউ কিছু বলবে না। চমৎকার প্ল্যান নিয়ে অমূল্য ওর ওই পাগলামি শব্দটা চালু করেছে।'

'মানে বয়সটা তো এখনও যায় নি।' কেমন যেন ঠোঁটের কোণায় হাসল শোভা। 'পৃথিবীর আর কাউকে না পেয়ে তোর মতন একটা জোয়ান ছেলেকেই অন্ধকার রাত্রে হাতছানি দিয়ে ডাকছে মেয়ে, ডেকে এসব বলছে, মানে জীবনে আবার বসন্তের ফুল ফুটবে, কোকিল-টোকিল ডাকবে এই ও আশা করছে আর কি।'

'যদি করেই থাকে ওর পক্ষে কি সেটা অন্যায়—অন্তত আমি তা মনে করি না। এভাবে দিনের পর দিন একটা বন্ধ ঘরে চুপ করে বসে থাকবে আর কাঁদাকাটা করবে—এ আমি সহ্য করতে পারছি না।' বিল্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গলার স্বরটাও যেন কেমন চড়ে গেল।

'আস্তে!' হিসহিস করে শোভা বলল, 'তুই দেখছি পাগলীকে দেখে পাগলীর কথাবার্তা শুনে দারুন মজে গেছিস। যেমন অক্ষরে অক্ষরে ওর সব কথা বিশ্বাস করছিস না!'

'হুঁ, বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে, না করে উপায় নেই—ওর তাকানোর মধ্যে ওর নিশ্বাসের মধ্যে আমি এত বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি—ও পাগল নয়, সুস্থ, তোর আমার চেয়ে বেশি ছাড়া কম সুস্থ নয়।'

'ব্যস,' শোভা চাপা গলায় হাসল, 'মনে হয় ওর নিশ্বাস-টিশ্বাসটাও যেন খুব গায়ে লাগিয়েছিস—আশ্চর্যের কিছু না, যেমন হুমড়ি খেয়ে জানালায় তখন দাঁড়িয়েছিলি দেখলাম। শিগগিরই ছুঁড়ির জীবনে আবার বসন্তের ফুল ফুটবে।'

বিল্টু হঠাৎ কথা বলল না। কেরাসিনের কুপির আলোয় দেখা গেল তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

'তা নতুন করে বসন্তের ফুল ফোটানোর জন্যই যদি অমূল্যর বোনের এত আকুলিবিকুলি, তবে আর মরা স্বামীর ফটো দেখতে চিঠি দেখতে ট্রাঙ্ক খোলার জন্য ও ব্যস্ত কেন।'

'মোটেই ও ফটো দেখতে চিঠি দেখতে ব্যস্ত নয়।' শোভার চোখের দিকে কটমট করে তাকাল বিল্টু। 'এ সব অমূল্যর কথা, অমূল্যর রটনা। ট্রাঙ্কের চাবি খুঁজে পাচ্ছিল না ডলি, চাবিওয়ালাকে দিয়ে নতুন চাবি তৈরী করিয়ে ট্রাঙ্ক খুলতে চাইছিল ও অন্য কারণে, অন্য জিনিস দেখতে।'

'কি জিনিস?'

'অমূল্যর মন, ওর দাদার বুকের ভেতরটা।'

এবার শোভা চমকে উঠে কপাল কুঁচকালো, বিল্টুর মুখটা দেখল।

'এ-কথা বলছিস কেন!'

'বলছি আজ ট্রাঙ্কের তালা খুলে ফেলেছে ডলি, খুলতে পেরেছে, খোলার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যর মন দেখা হয়ে গেছে ওর।'

কথাটা বুঝতে না পেরে শোভা কুঁচকোনো কপাল নিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে ভাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

একটা গুবরে পোকা ঘরে ঢুকে কুপির কাছে লাফালাফি করছিল।

'একটা মোটা লোহার শলা ঢুকিয়ে ডলি অনেক কষ্টে আজ তালাটা খুলতে পেরেছে।' গেলাসের জলে এঁটো হাত ধুতে ধুতে বিল্টু বলল, 'ট্রাঙ্কটা খুলতে পেরে ও এখন নিশ্চিন্ত। আর সারারাত তালার খটখট শব্দ করবে না। এই মাত্র আমি ওকে দেখে এসেছি। বলছিল, আজ নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারব, আমার সব চিন্তা দূর হয়েছে, হি-হি।'

যেন ডলির হয়ে বিল্টু হাসল। হাসতে গিয়ে চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। হাসিটা কেমন অদ্ভুত, হেঁয়ালির মতন ঠেকে শোভার। কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে সে চুপ করে থাকে।

॥ দশ ॥

এখন বেলা ন'টা। ভাত খেয়ে অমূল্য অফিসে বেরিয়ে গেছে।

হরলাল আজ বড়ো চুপচাপ। গম্ভীর। সেই সকালে ঘুম থেকে উঠে রোজকার মতন উনুন ধরিয়ে তাড়াহুড়ো করে অমূল্যর ভাত রেঁধে দিয়েছে।

খেতে বসে কেন জানি অমূল্য আজ একটা কথাও বলে নি।

কাজেই হরলালও চুপ করে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মনে মনে যা সে চেয়েছিল।

হুঁ, আজ বাজারের পয়সা দিয়েছে। কাল মাইনে পেয়েছে। আজ আর মুদি দোকান থেকে খাতায় লিখে ধার করে ডাল আলু আনা নয়। আজ তারা মাছ খাবে। পরপর সাতদিন নিরামিষ খেয়ে বাড়ির সকলের জিভ পচে গেছে। অমূল্য এটা বোঝে। এদিক দিয়ে তার সুবিবেচনার, তার কর্তব্যবোধের শেষ নেই। অমূল্যর কাছে এ-বাড়ির প্রত্যেকটা প্রাণীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানাবে কে এক হরলাল ছাড়া। ছোট্‌কা? বাজারের পয়সা হাতে পেয়েই নাচতে নাচতে থলে নিয়ে বাড়ি থেকে ছোঁড়া বেরিয়ে গেছে। আজ তার মুখে হাসি ধরে না। ওই পয়সা থেকে চার ছ আনা ঠিক সে পকেটে ঢোকাবে। আজ আবার তার হাত-খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কাজেই যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তবে দাদাকে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে। এখানে বাবা তো কিছু না, দাদাই সব। ঘুম থেকে উঠেই দাদা বাবাকে টাকাটা না দিলে ছোট্‌কা এমন নাচতে নাচতে কাঁচা বাজারে ছুটতে পারত?

যাই হোক, আর কে কৃতজ্ঞতা জানাবে এ-বাড়ির বড় ছেলেকে। ডলি?

ডলি দাদার ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। আজ সাতদিন পর মাছ দিয়ে ভাত খাবে জেনেও অমূল্যকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ওর বয়ে গেছে কিনা!

কৃতজ্ঞতা জানাবার দায় একলা হরলালের।

যেন এই জন্যই হরলাল এখন ঘরের সামনে পায়চারি করছিল। পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে হলুদ চাকা চাকা রোদ তার গায়ে মুখে পড়েছে।

কিন্তু মুখটা অন্য দিন যেমন খুশি খুশি দেখায়, অর্থাৎ অমূল্যকে রেঁধেবেড়ে চারটি গরম ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠাবার পর যে তৃপ্তি ও সন্তোষ হরলালের চোখে-মুখে ঝুলতে থাকে, আজ তার ছিটে-ফোঁটাও দেখা যাচ্ছিল না। বরং মুখটা ভয়ানক কালো করে রেখেছে সে।

তাই তো, এতবড় একটা কথা অমূল্যকে সে বলবে কেন? অমূল্যকে দিয়ে এমন একটা কাজ? বিশ্বাস করা হরলালের পক্ষে কেবল অসম্ভব নয়, অযৌক্তিক। বাড়ির বড় ছেলে সে। এত করেছে অমূল্য সংসারটার জন্য।

'পাগল, তুই পাগলের মতন বকছিস ডলি।' হরলাল দাঁত খিঁচোয়।

'আমি পাগল নই। তোমরা আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছ।'

'নিশ্চয় তুই পাগল। তোর আত্মহত্যা করা উচিত। অমূল্যকে নিয়ে কি করে তুই এতবড় একটা সন্দেহ—'

'সন্দেহ না, তুমি এস, আমার ঘরে এস, এই ছাখো ট্রাঙ্কটা খোলা, ডালাটা খুলতে পেরেছি—হি-হি।'

'হাসছিস, তাই তো বলি তোর মরে যাওয়া উচিত। ছি ছি, তোর ট্রাঙ্কের মধ্যে কি আছে শুনি কী ছিল? ক'টা শাড়ি সায়া ব্লাউজ, কিছু তেল সাবান, স্নো ক্রিমের দুটো কৌটো, আলতা কাজললতা—তা সবই তো ঠিক আছে। আর এসব থেকেও যা না থেকেও তাই। না থাকলেও কিছু আফশোষ ছিল না। তুই তো

ভাল শাড়ি সায়া পরিস না, ময়লা ছেঁড়া ব্লাউজ গা থেকে নামছে না—তেল সাবান স্নো ক্রিমের দরকার নেই তোর।—কি হল চুপ করে আছিস কেন! কাঁদছিস? এই হাসি এই কান্না। তোকে নিয়ে আমি কি করি বলতো?'

'তুমি এসো, তুমি এসে আমার বাক্সের ভিতরটা খুঁজে-পেতে ত্যাখো, তারপর তোমার যা বলার বলবে।'

'খুঁজে-পেতে দেখতে হবে না। আমি জানি তুই কী খুঁজছিস। মনতোষের চিঠি ফটো—' তেতো মতন একটা ঢোক গিলল হরলাল। 'তা ওই মানুষটা যে আর বেঁচে নেই, মনতোষ বেঁচে নেই এই মোটা কথাটা কি আজও তোর মাথায় ঢুকছে না! চিঠি ফটো দেখে খামখা কান্নাকাটি করবি—অমূল্য তাই সব সরিয়ে রেখেছে।'

'হি-হি, অমূল্য সব সরিয়ে রেখেছে।' ডলি হেসে কুটকুটি। 'তা হলে চাবিটা, আমার ট্রাঙ্কের চাবি তোমার বড় ছেলে লুকিয়েছে. এর উদ্দেশ্য কি, একবার তাকে জিজ্ঞেস করছ না।'

'না, তাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। পারা উচিত নয়! এই সংসারের জন্য সে যা করছে, তারপর আর তার কোনো কাজের সমালোচনা চলে না, কোনো রকম প্রশ্ন চলে না। সে যা করছে তোর ভালর জন্যই করছে, আমার ভালর জন্যই করছে—বেকার বাউণ্ডুলে, অন্ন ধ্বংস করা ছাড়া যার আর কাজ নেই এই সংসারে, সেই ছোট্‌কার ভালর জন্যও অমূল্য—'

'ওফ্, ভাল ছাড়া তুমি কিছুই দেখছ না অমূল্যর। এই জন্যই আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে—তোমাদের সকলের চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছে এ-বাড়ির বড় ছেলে।'

'আহ্, কী রকম বাজে ভাবনা, কেমন অকৃতজ্ঞের মতন কথাবার্তা তোর—' হরলালের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। জোরে মাথা ঝাঁকায় সে। যেন এখনি ঘরে ঢুকে পাগল মেয়ের চুলের ঝুঁটি চেপে ধরলে তার রাগ কমে। 'তোর কি ক্ষতি করেছে, কোন্

সর্বনাশটা করেছে অমূল্য যে—অ্যাঁ।' উত্তেজনায় হরলালের মুখে কথা আটকে যায়।

'আমার কোনো ক্ষতি করে নি। আমার কতটা সর্বনাশ করবে সে। ক্ষতি করেছে অমূল্য তার নিজের, নিজের পায়ে দাদা কুড়োল মারল।'

'নিজের পায়ে কুড়োল মারল, হতভাগী, আমি এখনি তোকে কেটে দু'টুকরো করব—তুই কি দিয়ে তার চরিত্রের বিচার করছিস!'

'হ্যাঁ গো বাবা, হ্যাঁ!' ডলির আবার খিলখিল হাসি। 'বিশ্বাস করছ না, এসো, তুমি আমার বাক্সের ভেতরটা উঁকি দিয়ে দ্যাখো, তবেই বুঝবে—আমাদের এই সংসারের জন্যে দাদার এতদিনের এত সব কষ্ট, আমার জন্য তোমার জন্য ছোট্‌কার জন্য শরীর পাত করে খাটাখাটনি, বুকের রক্ত ঝরানোর কোনো দাম রইল না, অমূল্যর সব সুনাম গঙ্গার জলে ভেসে গেল—'

'কেন, কি করেছে সে, একটা মরা মানুষের চিঠি ছবি সরানো ছাড়া আর কি লুঠ করেছে অমূল্য তোর বাক্স থেকে যে তার সম্পর্কে এত বিষ ঝরানোর তোর দরকার হয়ে পড়ল।'

'আহা, বিষ! বিষের মতন লাগছে কথাগুলো তোমার, স্বাভাবিক। যেহেতু তালা ভেঙ্গে আজ বাক্সটা খুলে ফেলেছি, খোলার সঙ্গে সঙ্গে এ-বাড়ির বড় ছেলে, মহৎ-ছেলে, ত্যাগী ছেলের সব গুণ সব সুকীর্তি ধরা পড়ে গেছে।'

'তুই মর, মরে যা! একলা রোজগেরে অমূল্য। এই সংসারে ঝুলে থেকে তুই আর কত জ্বালাবি ওকে।'

'উঁহুঁ, মরব না। মরতে আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। তা হলে মনতোষের খবর না পেয়ে এই ছ'বছরের যেকোনো একটা দিন গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ খেয়ে, কি গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করতাম। তা যখন করি নি, তোমাদের বোঝা উচিত আমার বাঁচবার সাধ-আহ্লাদ ষোল আনা রয়ে গেছে—না থেকে উপায় কি, মনতোষকে ঘিরে আমার মনে বসন্তের যে-ক'টা ফুল ফুটেছিল, তার

সব ক'টা এখনো তাজা টাটকা রয়ে গেছে। বরং টের পাই আরো বেশি ফুল ফুটেছে আমার মনে—'

'চুপ চুপ চুপ—' হরলাল নাক সিঁটকায়। 'এসব জঘন্য কথা পাপ কথা আমি শুনতে চাই না। আমি অমূল্যকে বলব, মনতোষের ছবি চিঠি তোকে ফিরিয়ে দিক। বরং সেসব নিয়ে তুই চব্বিশ ঘণ্টা —যেমন দু'বছর আগে—'

'হি-হি, অনেক দেরি হয়ে গেছে বাবা—মনতোষের স্মৃতি আঁকড়ে হাপুস চোখে কাঁদব, সেই দিন আমি পার হয়ে এসেছি, আমার মন এখন শক্ত পাথর, অমূল্য শক্ত করে দিয়েছে, যদিও আমাকে পাগল বানিয়ে রাখার ঝোঁকটাই তার বরাবর ছিল—সেভাবে তোমাকে সে বোঝাত, ছোট্‌কাকে বুঝিয়েছে, ডলির মাথার ঠিক নেই—জামির লেনের সব ক'টা মানুষকে অমূল্য তাই বুঝিয়েছিল—যে জন্য জামির লেনের সব ক'টা মানুষকে তোমাদের সবাইকে নিয়ে তার হৃদয়নগর চলে আসা—কি জানি বালিগঞ্জের পরিচিত পাড়ায় আমি কোন কেলেঙ্কারী বাধাই! বেশ বুদ্ধি করে রং ফলিয়ে কথাটা রাষ্ট্র করতে পেরেছিল সে—না উদ্দেশ্যটা সেদিন বুঝি নি, একটা সন্দেহ মনে উঁকিঝুঁকি দিত ঠিকই, যে জন্য ট্রাঙ্কটা রোজ খুলতে চেয়েছি, চাবি খুঁজতাম, চাবি না পেয়ে তালাটা ভাঙ্গা যায় কিনা তার জন্যও কম চেষ্টা করি নি—হি-হি, আজ তালা খুলেছি, আজ অমূল্যের বুকের ভেতরটা দেখে ফেলেছি—'

'এই চুপ কর—আমি আজ তোকে শেষ করব, খুন করব।' হরলাল চিৎকার করে উঠল। 'অ্যাঁ কত বড় সাহস তোর, অমূল্য সম্পর্কে এত বড় কথা, অমূল্যর কতটা দেখেছিস তুই, কী দেখেছিস—'

'আমার নেকলেস-চন্দ্রহার, হাতের দশগাছা ডায়মণ্ড-কাটা চুড়ি, কানের একজোড়া পাথর, আংটি—সব অমূল্য বাক্স থেকে সরিয়েছে—'

হতভম্বের মতন এক মিনিট মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হরলাল। পরক্ষণে জোরে মাথা ঝাঁকল।

'আমি বিশ্বাস করি না—এ কখনই হতে পারে না। নেবার মধ্যে তোর মরা স্বামীর চিঠি আর ঐ ফটোটা তোর ট্রাঙ্ক থেকে সে সরিয়েছে, আমি জানি। আর কিছু সে নেয় নি—নিতে পারে না…'

'নিয়েছে নিয়েছে, না নিলে আমার গয়না গেল কোথায়!' হি-হি করে ডলি আর হাসল না, হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

'চুপ চুপ—পাগল কোথাকার—তোর এই সমস্ত পাগলামি আমি কিছুতেই সহ্য করব না। অ্যাঁ, এতকাল শুনছিলাম অমূল্য চিঠি আটকে রেখেছে ফটো আটকে রেখেছে—এখন নতুন করে গয়নার বিলাপ শুরু হল।'

'এতকাল যে চাবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ট্রাঙ্ক খোলা যাচ্ছিল না, আমি টের পাই নি, আজ খুললাম, খুলে দেখলাম—'

'না, তোর ট্রাঙ্কে কোনো গয়না ছিল না।' হরলাল দাঁতে দাঁত ঘষল। 'অমূল্যর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। উন্মাদ কোথাকার—'

'ছিল, আমার গয়না ছিল—মনতোষের খোঁজ না পেয়ে মনের দুঃখে সব গা থেকে খুলে বাক্সে তুলে রেখেছিলাম, হার চুড়ি আংটি কানের পাথর—'

'উহুঁ, তোর কোন গয়না ছিল না—কোথায় তুই চন্দ্রহার আর ডায়মণ্ড কাটা চুড়ি আংটি পেয়েছিলি?'

'তুমি দিয়েছিলে, আমার বিয়ের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলে—তার জন্য মা'র গলার পুরোনো হারটা ভাঙতে হয়েছিল, মা'র হাতের বালাজোড়া, তাতে কুলোয় নি, তার ওপর তোমাকে দু'হাজার টাকার ওপর ধার করতে হয়েছিল। এই নিয়ে কত রাগারাগি করেছিলে মা'র সঙ্গে।'

'উহুঁ, আমার মনে পড়ে না—' হরলাল আবার মাথা ঝাঁকাল: 'আমি তোকে কোনো গয়না দেই নি—স্রেফ শাঁখা-সিঁদুর পরে তোর বিয়ে হয়েছিল।'

'ইস্, আজ তুমি সব অস্বীকার করছ, না কি, তোমার ভাল ছেলে সাধু ছেলে অমূল্যর মুখ বাঁচাতে ইচ্ছে করে সব ভুলে যাচ্ছ—যেহেতু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি আমার বিয়েতে রাজী হয়েছিলে—আর তাই নিয়ে মা'র সঙ্গে রাতদিন রাগারাগি, আমার গয়না গড়ানো নিয়ে মা'কে সে কি গালিগালাজ—সব ভুলে যাচ্ছ? বলতে, আমি সর্বস্বান্ত হলাম তোর আহ্লাদী মেয়ের জন্য, আমি রাস্তার ভিকিরি হলাম—'

'না আমি এসব বলিনি, পাগল, কেন আবোল-তাবোল বকছিস্—তোর বিয়েতে তোকে কোনো গয়নাই দেওয়া হয়নি—মাথা যেদিন ঠিক হবে সেদিন সব তোর মনে পড়বে—'

'শোনো শোনো…' ডলি পিছন থেকে ডাকে। হরলাল আর দাঁড়ায় নি।

'আমার চন্দ্রহার, ডায়মণ্ড-কাটা দশগাছা চুড়ি, কানের পাথর আংটি—সব তোমার বড়ছেলে বাক্স থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে—সব নিয়ে গেছে,' চিৎকার করে ডলি বাড়ি মাথায় তুলছিল। তবু ভাল অমূল্য তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কানে একরকম আঙুল চাপা দিয়ে হরলাল ওই ছোট ঘরের জানালার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসেছে। তখন রাত ক'টা? আকাশে শুকতারা জ্বলছিল।

এখন বেলা ন'টা। চতুর্দিক ফরসা। আকাশ পৃথিবী রোদে ভাসছে। বাড়ির বাইরে সদরের কাছে পায়চারি করতে করতে হরলাল শেষ রাত্রের দৃশ্যটা যেন নতুন করে চোখের সামনে দেখল। দেখে শিউরে উঠল। তার কপালের শিরাটা সেই যে ক্রমাগত লাফাচ্ছে আর যেন ঠাণ্ডা হতে চাইছে না।

'ছোট্‌কা এলি?'

'হুঁ'

পায়ের শব্দ শুনে হরলাল ঘাড় ফেরায়। থলে হাতে ছোট

ছেলে বাড়িতে ঢুকছে। উঁহু, আজ আর ছেলের হাত থেকে বাজারের থলে কেড়ে নিয়ে মেঝেয় উপুড় করে সব ঢেলে দিয়ে মাছের দর ওজন, আনাজপত্রের দাম হিসেব করতে একটুও উৎসাহ পেল না। চুপ করে হরলাল দাঁড়িয়ে রইল। ছোট্‌কা নিজেই একে একে থলে থেকে সব বার করে বাবাকে হিসেব দিয়ে গেল।

'ঠিক আছে ঠিক আছে।' হরলাল থুতনি নাড়ল। দু'টাকার বাজার থেকে ক'পয়সা আর সরাবে ছেলে। সব অগ্নিমূল্য। 'এই সওদা থেকে তুই কিছু পুকুর চুরি করবি না।'

শুনে ছোট্‌কা খুক করে হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

'তুমি এখনো মন খারাপ করে বসে আছ?' বাবার মুখ দেখে ছোট্‌কা চিন্তিত হল।

'কি করব, এখনো চিৎকার করছে, এখনো সেই গয়নার বিলাপ—'

'ছেড়ে দাও তো, পাগলের কথা নিয়ে এত মাথা ঘামালে চলে! তুমিও যেমন।'

'চলে না। কিন্তু—' হরলাল থেমে গেল।

বাজারে যাবার আগে বোনের চেঁচামেচি ছোট্‌কা শুনে গেছে। ভাগ্যিস অমূল্য জেগে উঠে যতক্ষণ বাড়িতে ছিল ছুঁড়ি চুপ করে ছিল। হয়তো সেটা অমূল্যর ভয়ে। ঠাণ্ডা মানুষ। খেপে গেলে উপায় নেই। যে জন্য সকালের দিকে হরলাল কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল। অমূল্য বেরিয়ে গেছে পরে আবার শুরু হয়েছে। কিন্তু যার নাম পাগল। এই ভয়টা কি শেষ পর্যন্ত থাকবে। যেমন জেদ করে এক একবার জানালার পাল্লাটা খটাস খটাস বন্ধ করছে আর খুলছে আর নেকলেসের জন্য, চুড়ির জন্য চেঁচামেচি করছে—হরলালের ভয়, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত না এই চলে।

'মনে কর অমূল্য যদি কথাটা শোনে, কি ভাববে সে? কি মনে করবে?' ছোট ছেলের চোখে চোখ রেখে হরলাল গভীর নিশ্বাস ফেলল।

'কিছুই মনে করবে না। পাগল। পাগল তো কত কি বলে।' জামার হাতায় ছোট্কা কপালের ঘাম মুছল। 'তোমাকে একটা কথা বলব, ভাবছি বলব কিনা।'

'কি কথা?' হরলাল ভুরু কুঁচকালো। 'বল্ না, বলে ফ্যাল।' ছেলেকে অভয় দিল।

'তুমি কাল রাত্রে কখন উঠেছিলে? মানে কখন তোমাকে গয়না-টয়নার কথা বলল ছোড়দি?'

'হুঁ, তখন ভোর চারটে। তালার শব্দ-টব্দ আর পাচ্ছিলাম না, ভাল ঘুম হচ্ছিল না কাল রাত্রে, বার বার আমি জেগে গেছি। ভাবলাম ডলি এত চুপচাপ কেন। কেমন একটা সন্দেহ হল। গিয়ে দেখি ওর ঘরের বাইরের দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।'

'তারপর?'

'ঐ আমায় দেখেই তখন হার চুড়ি আংটি তুলের কান্না শুরু হল। কাল ট্রাঙ্কের তালা খুলে ফেলেছে পাগল। ট্রাঙ্কের মধ্যে নাকি গয়না নেই।'

'মানে দাদা সরিয়ে নিয়ে গেছে গয়না—যেহেতু দাদা ওর বরের চিঠি ফটো সরিয়েছিল—এই জন্যই তো দাদাকে সন্দেহ?'

'হুঁ, তাই তো ভাবছি, যদি অমূল্য অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কথাটা শোনে—ওফ্, চিন্তা করতেও আমার কেমন গা কাঁটা দিচ্ছে —বলে কিনা যে ছেলে আজ একটানা এতগুলো বছর গরুর মতন খেটে খেটে এই সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তিন-তিনটে প্রাণীর খাওয়া-পরা বাড়ি ভাড়া থেকে আরম্ভ করে সব কিছু চালাচ্ছে —তার নামে এই বদনাম, এতবড় অপবাদ! ছি ছি!'

'তুমি চুপ কর তো, কথাটা শুনলেও দাদার গায়ে মাখতে বয়ে গেছে কিনা—দাদা ঠিক বুঝবে পাগলের প্রলাপ। পাগল অনেক কিছু বলে। তা ছাড়া যে-কথাটা তোমাকে বলছিলাম্—'

'হুঁ, কি যেন বলছিলি ?' হরলাল উৎসুক হয়ে উঠল। তেতে-ওঠা রোদ বেঁকে এসে পায়ের কাছে পড়েছে। মেঝেয় ছড়িয়ে রাখা মাছ শুকিয়ে কাঠ হতে লাগল। জল না পেয়ে ঝিঙে পটল শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেল। মাছের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে আসছিল। হরলালের আজ সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ফিসফিস করে ছোট্কা কথাগুলো বলল। হরলাল কান পেতে শুনল। এক মিনিট গম্ভীর হয়ে ছিল। তারপর হরলালের দু'চোখের তারা গোল হয়ে উঠল।

'তবে তো হয়েইছে—একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ—পাগল, তার ওপর বাইরে থেকে উস্কানি, তুই ঠিক দেখেছিস ?'

'হুঁ, কাল-পরশু দু'দিনই আমার চোখে পড়েছে, ক'দিন রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্ছে না, দু'দিনই যখন জেগে উঠে বাইরে গেছি, দৃশ্যটা আমার চোখে পড়েছে, হাতছানি দিয়ে ছোড়দি ঘোষবাড়ির ছেলেটাকে ডাকছে। ওর নাম বিল্টু, ভয়ানক বাজে ছেলে। চায়ের দোকান দিয়েছে স্টেশনের কাছে। বাড়িতে একটা পয়সা দেয় না। স্বার্থপর।'

'মানে সেলফিস্ জায়েন্ট।' হরলাল থুতনি নাচাল। 'তবে তো হয়েইছে। আমি যা সন্দেহ করছিলাম, এই বিকৃতি আমার মেয়ের মধ্যে এলো কি করে। ও তো ওর মরা স্বামীর চিঠি ও ফটোর জন্য কাঁদাকাটি করছিল। হঠাৎ নতুন করে গয়নার কথা মনে পড়ছে কেন! হুঁ হুঁ, এখন জলের মতন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই না তখন ছুঁড়ি বলছিল, আমার সাধ-আহ্লাদ ফুরোয় নি, বসন্তের ফুল ফুটছে—পাগল, পাগলেরও কতরকম ঝোঁক মাথায় চাপে ত্যাখো।'

'ওই বিল্টুই ওর মাথাটা আর এক ভাবে খারাপ করছে।' ছোট্কা খিক্ করে হাসল। 'ছোড়দির কি এত সব গয়নাগাটি ছিল ?'

'আমি তো দেখি নি, আমার মনে পড়ে না। বলছে বাক্সের ভেতর ছিল।'

'বিয়ের সময় তুমি যেন ওর গায়ে ক'পদ জিনিস গড়িয়ে দিয়েছিলে? ক'বছর হয়ে গেল, আমিও ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'হুঁ, দিয়েছিলাম, কিন্তু সেসব এখানে এসে পরতে দেখি নি। আমার তো মনে হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার সময় সেখানেই তোর ছোড়দি সব রেখে এসেছিল।'

আর হাসল না ছোট্‌কা। গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'তাই হবে, এখন ওই বিল্টু বেটার পাল্লায় পড়ে পেঁচ দিয়ে ডলি তোমার কাছ থেকে কিছু সোনাদানা আদায় করতে চাইছে।'

'আমি সোনাদানা দেব কোথা থেকে। তোর দাদা ছুটো পয়সা রোজগার করে, তাই ছুবেলা ছুটো খেতে পাচ্ছি। আমার কি রোজগার করার ক্ষমতা আছে!'

'দাদা শুনলে খুব রাগ করবে। ঠাণ্ডা মেজাজ। কিন্তু চটে গেলে রক্ষে আছে! ঘোষবাড়ির ওই ছোঁড়ার সঙ্গে পীরিত করা বার করে দেবে। জুতোপেটা করবে। তুমি বেধবা হয়েছ, রীতিমত মন্ত্র পড়ে আর একজনকে বিয়ে করেছিলে।'

'আরে এটাকে কি আর পীরিত বলে! ওই ঘোষবাড়ির উল্লুকটার উস্কানি পেয়েই এসব আবোল-তাবোল বকছে পাগলী। কোনটা পীরিত, কোনটা বা ভালবাসা এখন কি আর চিন্তা করার ক্ষমতা আছে ওর। যখন যা ঝোঁক চাপছে মাথায়, মুখে তাই বলছে। হয়তো নতুন করে গয়না গড়িয়ে একদিনও সেসব পরবে না, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ওই লেবু-জঙ্গলে ফেলে দেবে। আজ বিল্টু এসে দাঁড়ালে ওর সঙ্গে ফিসফিস গুজুর গুজুর করছে। কাল আর এক খেয়াল চাপবে মাথায়—দেখা যাবে যে জানালার কাছে

বিল্টু এসে দাঁড়ালে ভেংচি কাটছে, থুথু ছিটোচ্ছে ছোঁড়ার মুখে। পাগলকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।'

'তবে আর কি, তুমি মন খারাপ করছ কেন। চেঁচাক খুব চন্দ্রহার চন্দ্রহার করে—এইবেলা মাছ কুটে ফেলে চট করে উনোনে চাপিয়ে দাও, অনেক বেলা হল।'

'না, ভাবছি, অমূল্য যদি এসে শোনে ওর ট্রাঙ্ক থেকে সে গয়না সরিয়েছে—কিরকম শক্ লাগবে ছেলের মনে। এই আক্রার বাজারে মুখে রক্ত তুলে যে এতগুলো প্রাণীর আহার জুটিয়ে যাচ্ছে।'

'কিস্সু হবে না দাদার কানে গেলে—পাগলের কথা কে গায়ে মাখে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' ছোট ছেলে হরলালকে অভয় দিল।

॥ এগারো ॥

কিন্তু তবু হরলালের দুশ্চিন্তা কাটল না। সারাদিন ছটফট করল। বিকেলর দিকে ডলি যদিও আর চেঁচামেচি করছিল না বা জানালার পাল্লা নেড়ে ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছিল না। ভিতর থেকে দরজার খিল আঁটা। এক সময় পা টিপে টিপে ওর ঘরের দরজার কাছে সরে গিয়ে হরলাল কান পেতে থেকে টের পেল মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। মানে অধিকাংশ দিন যা করে। রাত্তিরে চোখে ঘুম নেই। সারাদিন ঘুমোয় না—বিকেল পড়তে কেমন নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ে। তখন রীতিমত নাক ডাকিয়ে খানিকটা সময় ঘুমিয়ে নেয় ডলি। সব পাগলই সন্ধ্যার আগে এ-ভাবে ঘুমোয় কিনা হরলালের জানা নেই। তবে আজ হরলালের কাছে মেয়ের এই অবেলায় ঘুমটা ভাল লাগল। মানে অমূল্য বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচামেচিটা শুনবে না। কিন্তু তা হলেও বলা যায় কি। হয়তো অমূল্যর মুখ হাত ধোয়ার শব্দ শুনে পাগল জেগে উঠল।

কাজেই একটা উৎকণ্ঠা গলার কাছে চেপে রেখে হরলাল বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। অমূল্য কখন ফেরে। ট্রেনের গোলমাল হলে কোনো কোনো দিন রাত আটটা ন'টাও বেজে যায়। আজ কি সেরকম কিছু হবে? যে জন্য সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হরলালের দুশ্চিন্তাটা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

একসময় অমূল্য ফিরল। হরলাল জল তুলে রেখেছিল। জামা-কাপড় ছেড়ে অমূল্য মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসল। হরলালের ইচ্ছে করছিল তখনই কথাটা তোলে। কারণ সে চিন্তা করে দেখেছে, হঠাৎ ওই পাগলের মুখ থেকে এমন একটা জঘন্য অপবাদ শুনে আঘাত পাওয়ার চেয়ে আগেভাগে অমূল্যকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা

ভাল। তাতে অমূল্যর মনটা তৈরী থাকবে। তখন ভেবেচিন্তে অমূল্য যা করার করবে, বোনকে যা বলার বলবে। হরলাল তো তার কর্তব্য শেষ করল।

কিন্তু খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বড় ছেলের কানে সে কিছুই তুলল না। যদি খাওয়া নষ্ট হয়! হবেই, মিথ্যা দুর্নাম কে হজম করতে পারে।

খেয়ে উঠে মুখ ধুয়ে অমূল্য বাইরে সদরের কাছে দু'তিন মিনিট পায়চারী করল। হাওয়াটা মিষ্টি। জ্যোৎস্নাটাও সুন্দর। পায়চারী সেরে সে ঘরে ঢুকতে হরলাল কথাটা তুলল, একটু ঘুরিয়ে, 'ডলির বিয়েতে ক'পদ গয়না দেওয়া হয়েছিল অমূল্য তোর মনে আছে?'

'হুঁ, আছে। কেন থাকবে না!' আচমকা এমন একটা প্রশ্ন শুনে অমূল্য অবাক হল। এক সেকেণ্ড বাবার মুখটা দেখল। তারপর ঘাড় কাৎ করল। 'একটা নেকলেস, ওই যে চন্দ্রহার না-কি বলে, বোধ হয় দশগাছা চুড়ি। একজোড়া পাথরের দুল। দুটো আঙটি ছিল মনে হচ্ছে।'

'এত দিয়েছিলাম!' হরলাল ভুরু কুঁচকালো। 'আমি যেন ভুলে যাচ্ছি।'

'এর জন্য মা'র গলার হার ভাঙতে হয়েছিল, হাতের বালাজোড়া ভাঙতে হয়েছিল। তার ওপরও তোমাকে হাজার দুই টাকা দেনা করতে হল।'

মুখটা কালো করে হরলাল একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'কেন, কি হয়েছে!' অমূল্য বলল।

'না কিছু হয় নি।' হরলাল অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আজ ছোট্‌কা ভাল ছেলে হয়েছে। হ্যারিকেনের চিমনিটা খুব করে ছাইটাই ঘসে পরিষ্কার করেছে। দোকান থেকে কেরোসিন এনে বেশ খানিকটা তেলও হ্যারিকেনে ভরেছে। কাজেই আজ আর আলোর কোনো ত্রুটি ছিল না। অর্ধচন্দ্রাকৃতি নিটোল পরিচ্ছন্ন

একটা শিখা নিয়ে বাতিটা জ্বলছিল। কিন্তু হরলালের যেন মনে হল এতটা আলো, এতটা উজ্জ্বলতা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। বিশেষ করে এই মুহূর্তে। যেখানে এমন একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তাকে তুলতে হচ্ছে। কথাটা শোনা মাত্র অমূল্যর চোখ-মুখের কেমন চেহারা হবে কল্পনা করতেও যেন সে ভয় পাচ্ছিল। যে জন্ম মুখটা চট করে ঘুরিয়ে রাখল।

'যাও, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।' অমূল্য আলস্যের হাই তুলল। বিছানাটার দিকে একবার তাকাল। তার বিছানা পেতে হরলাল সেই সন্ধ্যাসন্ধি মশারিও খাটিয়ে রেখেছে। 'আমিও এখন শোব। বড্ড টায়ার্ড লাগছে।' অমূল্য আর একটা হাই তুলল।

'তা তো লাগবেই,' হরলাল এদিকে ঘাড় ফেরাল। আর এক সেকেণ্ড কাটল। দুজনেই চুপচাপ।

'তোমার কি আরও কিছু বলার আছে?' অমূল্য তখনই আবার প্রশ্ন করল।

'আর বলা!' আক্ষেপের সুর করল হরলাল। 'পাগলের নতুন পাগলামি শুরু হয়েছে।'

'ডলি? কি করছে!'

'আমি বাবা, সত্যি বলতে কি, যখন ও শেষবার শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে আসে, ওর গায়ে কোনো গয়নাই দেখি নি।'

'না, তখন কোনো গয়না ছিল না। কেন না সুনামগঞ্জ থেকেই তো মনতোষের ওই সাংঘাতিক খবর শুনে ও এখানে চলে আসে। গয়না গায়ে রাখার মতন ওর মনের অবস্থা ছিল না।'

'হুঁ, তা ছিল না, কিন্তু—' কাতর চোখে হরলাল অমূল্যর মুখটা দেখল। 'সত্যি বলতে কি বাবা, আমি এক দিনের জন্যেও ওর ট্রাঙ্ক ছুঁয়ে দেখি নি—'

'হুঁ, তারপর! কি হয়েছে বলো।' অমূল্য যেন খানিকটা অধৈর্য হয়ে উঠল, 'গয়নার কথা কি বলছে ডলি?'

'বলছে ওর ট্রাঙ্কে নাকি সব তোলা ছিল।'

'তারপর ?'

'এখন নেই।'

'ট্রাঙ্ক ও খুলল কি করে ? ওর ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে। তালা ভেঙেছিল বুঝি ?'

'ওই আর কি, হয়তো ভেঙেছে তালাটা, একটা লোহার সিক ঢুকিয়ে কেমন করে খুলেছে, আমায় বলছিল।'

'তারপর ?'

'ওই গয়নার জন্য এখন কান্নাকাটি, আমার হার চুড়ি আঙটি ভুল গেল কোথায়!'

অমূল্য একটু সময় স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আমার মনে হয় কি ?' যেন হোঁচট খাবে ভয়ে হরলাল সাবধানে পা বাড়ায়। সেভাবেই একটু থেমে থেকে আবার বলল, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন চলে আসে গায়ের গয়না খুলে ওখানেই ও রেখে এসেছিল, মাথার তো ঠিক নেই মেয়ের, তাই মনে করতে পারছে না, বলছে ট্রাঙ্কেই অলংকারগুলো ছিল।'

'হুঁ, ট্রাঙ্কেই ছিল।' যেন গায়ের সব আলস্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অমূল্য হঠাৎ সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। মাথাটা দু'বার ঝাঁকাল। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওর বাক্স খুলে মনতোষের চিঠি ও ফটোটা যেদিন সরিয়ে এনেছিলাম সেদিনও গয়নাগুলো ছিল। একটা ছোট চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে ছিল। কাঠের বাক্সটা ট্রাঙ্কের বাঁ কোণের দিকে ওর পশমী আলোয়ানের ভাঁজের মধ্যে ছিল।'

'কি আশ্চর্য।' হরলাল বিড় বিড় করে উঠল। তার মুখের শুকনো পেশী কুঁচকে দলা পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। 'তবে যে ও বলছে—'

'কি বলছে ?' অমূল্য রীতিমত ধমকে উঠল।

'চিঠি ও ফটোর সঙ্গে দাদা আমার গয়নার বাক্সও তুলে নিয়ে গেছে।'

'আমি!' অমূল্য এমন চোখ করে তাকাল, হরলাল ভয় পেল, ছেলের দৃষ্টি এড়াতে মুখটা তখনই আবার অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল।

'দাঁড়াও, আমি ওর ট্রাঙ্ক খুঁজে দেখব।' তেমনি ধমকের গলায় অমূল্য বলল, 'চাবিটা কোথায়?'

'আমি তো চাবি রাখি নি। তোর কাছে ছিল।'

'আরে আমার কাছে আর তোমার কাছে কি, এক জায়গায়ই তো ওটা তুলে রেখেছিলাম, তোমায় দেখিয়ে রেখেছিলাম. ওদিকের দেওয়ালের পরমহংসদেবের ফটোটার নিচে ছোট একটা পেরেকের গায়ে ঝুলানো ছিল। ত্যাখো আছে কিনা।' আঙ্গুল দিয়ে অমূল্য পরমহংসদেবের ফটোটা দেখাল।

হরলাল পা পা করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। যেন যথেষ্ট আলো যাচ্ছে না ওখানটায়। অমূল্য তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে মেঝে থেকে হ্যারিকেনটা তুলে উঁচু করে ধরল।

হরলাল দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে।

'পেলে?' অমূল্য পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

শব্দ না করে হরলাল শুধু মাথাটা নাড়ল।

'ও কি. মাথা নাড়ছ কি—নেই?'

'নেই।'

একটা লাফ দিয়ে অমূল্য দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'তাই তো চাবি গেল কোথায়!'

'আমার কিন্তু আর খেয়ালই ছিল না চাবিটা যে ওখানেই ছিল; সেই যে প্রথম দিন দেখেছিলাম—'

'হ্যাঁ, তোমায় দেখিয়ে রেখেছিলাম, কারণ ছিল, পাগলকে দিয়ে তো বিশ্বাস নেই, ছবি ও ফটোর জন্য কান্নাকাটি করুক কি দেওয়ালে মাথা ঠুকুক, তাতে তেমন কিছু এসে যেতো না। কিন্তু যদি আরও

বাড়াবাড়ি করত, ওই যে মুখে বলত, গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরবে—সেরকম কিছু করছে দেখলে, আমি তো সারাদিন অফিসে থাকি, তুমি পরে ট্রাঙ্কটা খুলে মনতোষের চিঠি ও ফটোটা আবার রেখে আসতে পারো সেজন্য তোমাকে দেখিয়ে ওখানে চাবি রেখে-ছিলাম, মনে আছে?'

হরলাল আস্তে মাথা নাড়ল।

'মনতোষের চিঠি দু'খানা ও ফটোটা জায়গা মতন আছে তো?'

বড় একটা ঢোক গিলে অমূল্য বলল, 'দেখছি।' এক-হাতে আলোটা ধরে রেখে অমূল্য আর এক হাতে তার বিছানার শিয়রের দিকের তোষকটা উল্টে ফেলল। 'হুঁ, চিঠি ফটো ঠিকই আছে।' অমূল্য ঘুরে দাঁড়াল।

'তা হলে চাবি গেল কোথায়?' হরলাল বলল।

'তোমরা জান, তোমরা সারাদিন বাড়িতে থাক, তুমি, ছোট্‌কা, ছোট্‌কাকে ডাক।'

ডাকতে হল না, যেন ছোট্‌কা চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে বাবা ও দাদার কথা শুনছিল। এবার নিঃশব্দে সে ঘরে ঢুকল।

'এখানে ডলির ট্রাঙ্কের চাবি ছিল। এই পেরেকে ঝুলান ছিল। তুই দেখেছিস?'

'না,' দাদার চোখে চোখ রেখে ছোট্‌কা মাথা ঝাঁকাল।

'তুই দেখিস নি, বাবা দেখে নি—তবে চাবিটা গেল কোথায়!' হঠাৎ গলার স্বরটা নিচে নেমে গেল অমূল্যর। যেন ক'মিনিটের উত্তেজনায় সে ক্লান্ত। মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'তা চাবি দিয়ে আর এখন কি হবে—ও তো বলছে তালা ভেঙ্গে ট্রাঙ্ক খুলে ফেলেছে—'

'হুঁ, ট্রাঙ্ক খুলে ফেলেছে।' হরলালের কথার পুনরাবৃত্তি করল অমূল্য। 'চাবি দিয়ে এখন কি হবে—কিন্তু ওর গয়নার কি হল, চাবি ছাড়া তো কেউ ট্রাঙ্ক খুলতে পারে নি—ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্স কে সরাল।'

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরের মধ্যে। ছোট্কা বাবার দিকে তাকায়। অমূল্য ছোট্কার মুখটা দেখতে থাকে। হরলাল একবার অমূল্যকে, একবার ছোট ছেলেকে দেখে। তিনজনের মুখে কথা নেই। তারপর হরলাল কথা বলল।

'যদি তাই হয়ে থাকে, তুই যদি মনতোষের ছবি ও ফটো সরাবার সময় সেই চন্দনকাঠের বাক্সটা ট্রাঙ্কের কোণায় ওর পশমী আলোয়ানের ভাঁজের মধ্যে দেখে থাকিস তবে নিশ্চয় ওটা সেখানেই আছে, ভাল করে খুঁজে-পেতে না দেখেই পাগলী চেঁচামেচি শুরু করেছে।'

'আমি এখনি যাচ্ছি—ট্রাঙ্কটা যখন খোলা আছে, কাপড়চোপড় সরিয়ে ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখব—' লাফ দিয়ে অমূল্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'হ্যারিকেনটা নে, অন্ধকারে কিছু দেখবি না, ওর ঘরে আলো কোথায়?' পিছন থেকে বলতে বলতে হরলাল স্থির হয়ে দাঁড়াল। কেননা ডলির ঘরের দরজা পর্যন্ত যায় নি অমূল্য, ভিতরের দিকের বারান্দায় মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে ডলি হি-হি করে হাসছিল। যেন অমূল্যকে দেখতে পেয়েছে ও। এদিকের কোনো ফাঁক দিয়ে দেখে থাকবে।

'উহুঁ, এ-ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দেব না। আমি দোর খুলব না। আমার বাক্স খুঁজে লাভ কি, গয়না নেই। যে নেবার ঠিক তুলে নিয়ে গেছে।'

'কে তোর গয়না নিয়ে গেছে?' অমূল্য চিৎকার করে উঠল।

'নাম বলব কেন। তবে আমি জানি কে নিয়েছে, হি-হি হি-হি। আমি বাবাকে বলেছি।'

'বাবা!' অমূল্য এদিকে ঘাড় ফেরাল।

'অমূল্য!' হ্যারিকেনটা কপালের কাছে তুলে ধরে হরলাল বড় ছেলের মুখ দেখল। 'পাগলের কথায় তুই কান দিবি নে—হয়তো ও-ই ওর গয়নার বাক্স কাউকে দিয়ে দিয়েছে।'

'হুঁ, আমি দিয়ে দিয়েছি—তাই বোঝাও বাবা,' ডলি আর হাসে না। যেন কান্নার গলা। এই মুহূর্তে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠবে। 'এ ছাড়া আর তুমি কি বোঝাবে তোমার বড় ছেলেকে। তার মান রাখতে হবে—মন রাখতে হবে—তা না হলে যে তোমাকে উপোস থাকতে হবে।'

'এই পাগল!' হরলাল গর্জন করে উঠল। বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে চাপা নিশ্বাস ফেলল একটা। তারপর আবার চিৎকার করে উঠল। 'তুই কি চোখে দেখেছিস যে অমূল্য তোর গয়নার বাক্স সরিয়েছে?'

'চোখে দেখতে হয় না—সংসারে কিছু কিছু জিনিস ঘটে যা চোখে না দেখেও পরিষ্কার বোঝা যায়।'

'কেন, বাড়িতে শুধু অমূল্য না, আমি আছি, ছোট্‌কা আছে।'

'তুমি আমার গায়ের সোনা চুরি করবে? এই জন্যই কি মার গয়না ভেঙ্গে ও বাকীটা ধার-দেনা করে আমার বিয়ের হার চুড়ি গড়িয়েছিলে? চমৎকার যুক্তি। তাই তো বললাম স্রেফ ভাতের ভয়ে তুমি নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নিচ্ছ।'

'বেশ তো, আমাকে দিয়ে সন্দেহ না করিস, ছোট্‌কা আছে, ওকে সন্দেহ করছিস না কেন।'

'ওর সোনাদানায় কাজ নেই।' ডলি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। 'বাজারের পয়সা থেকে দু'চার আনা সরিয়ে ও তুষ্ট। ছোট্‌কাকে জিজ্ঞেস কর—তাই ও বলবে—'

'বাবা, তুমি কেন ওর সঙ্গে তর্ক করছ।' অমূল্যর গলার স্বর বিকৃত শোনাল। 'ও ডাইরেক্ট আমাকে সন্দেহ করছে—'

'কেন, ওর কি অধিকার আছে মিছিমিছি তোকে সন্দেহ করার—' হরলাল অমূল্যর চোখের দিকে তাকাল।

'তা জানি না, হয়তো এই আমার ভাগ্য, এই আমার নিয়তি—' বলতে বলতে অমূল্য শিশুর মতন হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। কপাল চাপড়াতে লাগল।

'এই অমূল্য, করছিস কি!' হরলাল ছেলের হাত চেপে ধরল।

'ও হো হো হো—এই আমার নিয়তি, এই আমার ভাগ্য, সারা জীবন যে-সংসারের জন্য কষ্ট করলাম, বুকের রক্ত ঝরালাম—আজ—আজও চিত্ত আমার অফিসে এসেছিল—বললাম, আমার মুক্তি নেই মুক্তি নেই—আমাকে বাকী সারা জীবন এভাবে ঘানি টানতে হবে—' হরলালের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অমূল্য আবার কপাল চাপড়ায়। 'ওফ্ এত করার পর আজ আমি কী পেলাম।'

'তুই কাঁদবি নে অমূল্য, আমি জানি তুই নির্দোষ। আয়নার মতন আমি আমার সন্তানদের প্রত্যেকের বুকের ভিতর দেখতে পাই, আমি প্রত্যেককে চিনি। জানি কার চরিত্র কেমন—এই ছোট্কা তুই চুপ কেন!'

'কি, আশ্চর্য, তুমি কি বলছ আমি ছোড়দির ট্রাঙ্ক খুলে—'

'তবে চাবিটা ঘর থেকে যাবে কোথায়।'

'আমি কি করে বলব।'

'হ্যাঁ, তুই বলবি।' খেপে গিয়ে হরলাল ছোট ছেলের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। 'আমি তোর স্বভাব জানি, সুযোগ পেলেই বাজারের পয়সা থেকে পয়সা চুরি করিস।'

'বাজারের পয়সা থেকে দু'চার পয়সা চুরি আর বাক্স থেকে এত সব গয়না চুরি কি এক কথা।'

'হ্যাঁ, এক কথা।' ছেলের চুলের ঝুঁটি ধরে হরলাল জোরে নাড়া দিল।

'হারামজাদা চাবি কোথায় লুকিয়েছিস বল, ডলির হার চুড়ি কোথায় রেখেছিস বল।'

'ওফ্, আমি সুসাইড করব, আমি রেললাইনে গলা দেব—' ছোট্কা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল।

'তাই দিবি, তাই দিতে হবে তোকে—' বিকৃত চেহারা করে হরলাল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'তুই ছাড়া এ কাজ কেউ করে নি—

জামির লেনের সাইকেলের দোকান থেকে একশ টাকা চুরি যেতে তোর নাম উঠেছিল কেন, দোকানে তো আরো কর্মচারী ছিল, পরে অমূল্যকে পকেট থেকে সেই একশ টাকা ভরে দিতে হয়—'

'ইস্, কী সাংঘাতিক কথা, আমি মরব, আমি মরে যাব।' ছোট্‌কা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

'এই অমূল্য, হারামজাদাকে তুই জিজ্ঞেস কর ডলির গয়নার বাক্স কোথায় সরিয়েছে—'

অমূল্য তখন কপাল চাপড়ান ছেড়ে দিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। 'আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই, চিত্তকে আমি আজও বলেছি, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া এই নরক থেকে উদ্ধার পাওয়ার আমার অন্য কোন রাস্তা নেই—'

'অ্যাঁ, যত অনিষ্টের গোড়া ওই শয়তানী, ওই পাগল—' যেন হরলাল পাগল হয়ে গেল। ছুটে ডলির ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বন্ধ পাল্লা দুটোর ওপর লাথি মারতে লাগল। 'এই খোল্ খোল্, আজ তোকে আমি কেটে দু'টুকরো না করি তো আমার নাম হরলাল নয়, কেমন আগুন লাগিয়েছিস তুই এই সংসারটায় একবার বেরিয়ে এসে ছাখ—'

কান্না কলরব চিৎকার নিয়ে লেবু ও পেয়ারা গাছে ঢাকা স্যাঁত স্যাঁতে পুরানো বাড়িটা থরথর করে কাঁপছিল। যেন কত রাত পর্যন্ত এসব চলল।

॥ বারো ॥

তেঁতুলতলার ইটের পাঁজা পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল তারা, একটা মানকচু ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু ভাই বোন ও-বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শুনছিল, কান্না চেঁচামেচি।

'ওই দাদাটার এই কীর্তি, ওর কাছে চাবি ছিল, গয়নাটা ওই সরিয়েছে।'

'কক্‌খনো না, আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।' শোভা মাথা নাড়ল। 'অত্যন্ত ভাল লোক সৎ-লোক ওই অমূল্যবাবু।'

'তা হলে তো বলতে হয় তোর লাভার ছোট্‌কারই এই কাজ।' বিল্টু এবার নাকে হাসল। 'ওপরটা দেখে মনে হয় ক্যাবলাকান্ত, আসলে ছোঁড়া বজ্জাতের ধাড়ী।'

'তুই সাবধানে কথা বলবি দাদা, তুই কি চোখে দেখেছিস যে ছোট্‌কা ওর বোনের গয়না চুরি করেছে?'

'তবে কে চুরি করল, এখানে চোরটা কে তুই আমায় বল।'

'কেউ চুরি করে নি।' পাতলা জ্যোৎস্নায় শোভার চোখ চকচক করে উঠল। 'আসলে পাগলের ট্রাঙ্কে কোনো গয়নাই ছিল না, এমনি পাগলামি করে বলছে—পাগল অনেক কিছু বলে।'

'মোটেই ও পাগল নয়।' বিল্টু জোরে মাথা নাড়ল। 'ওর ট্রাঙ্কে গয়না ছিল—কেউ একজন ঠিক সরিয়েছে—কাল আমাকে যা বলল, ওর দাদাই অপকর্মটি করেছে—এখন ভাল মানুষ সাজছে।' একটু থেমে থেকে বিল্টু আবার বলল, 'আমি ভেবে পাই না কি করে তুই ডলিকে পাগল বলিস, তুই কি ওর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেছিস, না ওকে চোখে দেখেছিস? হয়তো কোনোদিন মাথাটার একটু গোলমাল ছিল—আমি জানি না সত্যি কি মিথ্যে—কিন্তু ওকে

দেখে ওর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝলাম। ওর মধ্যে ছিটে-ফোঁটাও পাগলামি নেই, বাড়ির লোকে ওকে পাগল বানিয়ে রেখেছে।'

এবার শোভা অল্প হাসল।

'আমার মনে হয় তোর প্রেমে পড়ে, যেমন তুই বলছিস না, মেয়েটার মাথার দোষ সেরে গেছে।'

'ঠাট্টা করছিস, ঠাট্টা করার কিছু নেই।' বিল্টু খপ করে একটা উড়ন্ত জোনাকিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিল। 'প্রেমে পড়লে মানুষ পাগল হয়, আবার অনেক সময় প্রেম মানে ভালবাসা পেলে পাগলের পাগলামি চট্ করে সেরেও যায়—'

'ঐ শোন্।' শোভা হিস্ হিস্ করে উঠল। হাতের জোনাকিটা ছেড়ে দিয়ে বিল্টু কান খাড়া করে রাখল। ধপাস্ ধপাস্ শব্দ হচ্ছে ওদিকে। যেন কেউ দরজায় লাথি মারছে। তক্ষণি হরলালের গলা শোনা গেল: আমি আজ ঐ পাগলকে কেটে দু'টুকরো করব।

শুনে শোভার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাতের মুঠো দুটো শক্ত করে রেখে বিল্টু কেমন অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল। সে কিছু করতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে বুড়োটার গলা টিপে ধরে। মেয়েকে সে কাটবে কেন? ডলির তো কোনো দোষ নেই। চিন্তা করে বিল্টুর মাথাটা গরম হতে থাকে।

একটু পরেই অবশ্য আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন হঠাৎ বাড়িটা ঝিমিয়ে পড়ল। কান্না চিৎকার গলাবাজি কি দরজার পাল্লায় লাথির শব্দ—কিছুই আর শোনা গেল না। রাত বাড়ছিল। ঝিঁঝি ডাকছিল। 'আজ আর কিছু বোঝা গেল না, কাল বোঝা যাবে। চল ঘরে ফিরি।' বিল্টু বলল। শব্দ না করে শোভা দাদার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল।

পরদিন সারাটা সকাল কাটল। একবার ওকে চোখের দেখা দেখতে পেল না শোভা। মন ভীষণ খারাপ লাগছিল তার।

অন্যদিন তাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে থলে হাতে সে বাজারে যায় বা মুদিদোকানে যায়।

আজ যেন ছোট্‌কা বাড়ি থেকেই বেরোল না। অথচ তার দাদা অমূল্য ঠিক সাড়ে আটটা বাজতে কলকাতার ট্রেন ধরতে স্টেশনের দিকে ছুটে গেছে। যেমন রোজ যায়। দেখে শোভা অবাক হয়। এতবড় একটা ঘটনা ঘটল কাল রাত্রে অথচ আজ সকাল হতে মানুষটা আবার অফিস করতে ছুটছে। না গিয়ে উপায়ই বা কি। শোভা তখন ভাবল মন খারাপ করে ছোট্‌কার দাদাকে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। তাকে চাকরি করতে যেতে হবে, টাকা আনতে হবে, তবে তো ঘরের বাকী তিনটে মানুষ খাবে। ঈশ্বর এক-একটা মানুষকে এভাবে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে।

কিন্তু ছোট্‌কা করছে কি। মন খারাপ করে সে কি ঘরে বসে আছে, নাকি কোথাও চলে-টলে গেল!

শোভা খানিকক্ষণ তাদের বাড়ির পিছনে শিউলি গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে রইল। উহুঁ, ছোট্‌কার বাবাকেও ওদিকের রাস্তাটায় দেখা গেল না। অন্যদিন বুড়ো এই সময়টায় সংসারের কাজ থেকে খানিকটা অবসর হয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কিছুই বুঝতে পারছিল না শোভা। এত ছটফট করছিল তার মন! রোজকার মতন দুপুরবেলা কর্মচারীদের উপর দোকানের ভার দিয়ে বিল্টু ভাত খেতে বাড়ি এল। পিছনের ঝোপঝাড়ের রাস্তা ধরেই সে এল। কিন্তু সে-ও দেখল অমূল্যদের বাড়িটা কেমন শ্মশানের মতন খাঁ-খাঁ করছে। অমূল্যর বোন যে-ঘরটায় থাকে সেটার জানালা-টানালা সব বন্ধ।

'তাহলে ঐ ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি হল রে দাদা?' বিল্টুকে খেতে দিয়ে শোভা জিজ্ঞেস করল।

'কি করে বলব, মনে হয় খুব রাতটাত জেগেছে সব, সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।'

'ওদের দাদা কিন্তু অফিস করতে বেরিয়ে গেছে।'

'পরের চাকরি, উপায় কি, আমার মতন তো দোকান নেই ভদ্রলোকের।' একগ্রাস ভাত গিলে বিল্টু আবার বলল, 'দাদাটি অফিস সেরে সন্ধ্যের পর যখন বাড়ি ফিরবে আবার হয়তো আগুন জ্বলে উঠবে। গয়না-চুরির ব্যাপারটার এখনও কোনো ফয়সলা হয়েছে বলে মনে হয় না। এতো সহজে এসব নোংরা জিনিসের মীমাংসা হয় না।'

শোভা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। খেয়ে উঠে বিল্টু আবার দোকানে চলে গেল। মা খাওয়া-দাওয়ার পর রোজ দুপুরে যেমন শোয় এবং একটা পুরোনো মাসিকপত্রের পাতা উল্টোতে উল্টোতে একসময় নাক ডাকতে থাকে আজও তাই করতে লাগল। শোভা ভাত খেল। কিন্তু মুখে কিছুই রুচল না। অর্ধেক ভাত ফেলে রেখে পাতে জল ঢেলে উঠে পড়ল। কেবল ভাবছিল সে, বিকেলে তেঁতুলতলার সেই ইটের পাঁজাটার কাছে ছোট্‌কার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। যে জন্য বুকটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল তার। কান্না পাচ্ছিল।

ক্রমে বেলা পড়ে গেল। ইতিমধ্যে শোভা এক ফাঁকে, কোনদিন যা করে না, ঘুমিয়ে পড়ল।

জেগে উঠে বিকেলের লালচে রোদ্দুর দেখে তার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। পরপর হাই তুলল কয়েকটা। তারপর চুল বাঁধতে বসল। বুকটা এত খালি খালি ঠেকছিল।

কোথায় যেন একটা পাপিয়া ডাকছিল। কান পেতে শুনল একটু সময়। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিউলিতলায় এসে দাঁড়াল। রোজ যেমন হাওয়া খেতে দাঁড়ায়। তারপর পা-পা করে তেঁতুলতলার ইটের পাঁজাটার দিকে এগোতে লাগল। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

কিন্তু শোভা কি জানে যে ছোট্‌কা তার জন্য অপেক্ষা করছিল!

চোখ দুটো বসে গেছে ছেলের। সারা মুখে কেমন একটা কালির ছোপ। দেখলেই বোঝা যায় রাত্রে ঘুমোয় নি, সারাদিন যেন কিছু খায় নি। কেবল গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো জ্বলছিল। এমনি তো উসকোখুসকো চুল। তেল নেই, জল নেই। আজ যেন পাগলের মতন দেখাচ্ছে।

'কি হয়েছে তোমার!'

'অনেক কিছু হয়ে গেছে। সব কথার উত্তর দিতে পারব না। বাক্সটা শিগগির রাখ।'

'কিসের বাক্স!' শোভা চমকে উঠল। চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

'গয়নার বাক্স!' পায়ের কাছের কালকাসুন্দির ঝোপ সরিয়ে ছোট্‌কা চন্দন কাঠের একটা ছোট বাক্স তুলে শোভার হাতে দিতে গেল। যেন সাপ দেখে শোভা শিউরে উঠল। ভয় পেল। বাক্সটা ধরল না।

'কার গয়না! কোথা থেকে পেলে!'

'পরে বলব, এখন তো ওটা রাখ।'

'আমি কেন রাখব। ছিঃ, এ তো তোমার বোনের গয়না মনে হয়, তুমি চুরি করেছিলে?' ঘেন্নায় শোভা নাক কুঁচকালো।

'আমি চুরি করি নি, তবে আমার যখন চোর বদনাম রটেছে—এই জিনিস আর এখন আমি হাতছাড়া করছি নে।' ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল ছোট্‌কা। উত্তেজনায় কাঁপছিল সে। 'নাও ধর।'

'কী মুশকিল, আমি এটা রেখে করব কি?' রাগে দুঃখে শোভার প্রায় কান্না পেল। 'চুরির গয়না আমি কিছুতেই রাখব না।'

'কি বোকা মেয়ে!' ছোট্‌কাও রেগে গিয়ে দু'চোখ কুঁচকে ছোট করে ফেলল। 'অনেক টাকার জিনিস এখানে। অনেক টাকার সোনা। এই নিয়ে আমরা দু'জন কোথাও পালিয়ে যাব বুঝতে পারছ না!'

'না না না। এভাবে আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চাইনে।' শোভা জোরে শরীর ঝাঁকাল। 'ইস, তোমার বোনের গয়না, তোমার মধ্যে কি একটু দয়ামায়া নেই।'

'নেই।' ছোট্কা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার দয়ামায়া নষ্ট হয়ে গেছে। মিছিমিছি যদি কেউ তোমায় চোর বদনাম দেয় তো তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়!'

'কে বদনাম দিয়েছে তোমাকে?'

'ঐ বুড়ো শয়তানটা, আমার বাবা। জান, আজ আমি সারাদিন কিছু খাই নি। দাদাও খায় নি। না খেয়ে সেই সকালবেলা অফিস করতে কলকাতা চলে গেছে। আমার মনে হয় দাদা আর ফিরবে না। আমিও চাইছি আর যেন ফিরে না আসে। দাদার মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। আমিও ঠিক করেছি, কোথাও পালিয়ে যাব, আমি তুমি এক সঙ্গে।'

'আচ্ছা, সে যাওয়া যাবে।' যেন ছোট ছেলেকে সান্ত্বনা দিল শোভা। ছোট্কার কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল। 'এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে আমায় খুলে বলো তো? তোমার বাবা কি করছে? বুড়ো খেয়েছে?'

'উহুঁ, খাবে কি, আজ আমাদের হাঁড়িই চড়ে নি। বুড়ো রান্না করেনি।'

'কেন?'

'ঐ যে, নিজের দোষ ঢাকতে বাবা আমার কাঁধে সেটা চাপিয়ে দিল, আমি ছোড়দির ট্রাঙ্ক থেকে গয়না চুরি করেছি। এতবড় একটা মিছে কথা বলে বুড়ো কি শান্তি পাচ্ছিল, মোটেই না, আমি টের পেয়েছি, তারপর বাকি সারাটা রাত ছটফট করেছে।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাস হয়ে শোভা শুনল। 'নিজের দোষ ঢাকতে বলছ কি? তবে কি তোমার বাবা—' চোখ দুটো কপালে উঠল শোভার।

'হুঁ, বাবা, আমার বাবা ঐ কু-কাজটা করেছে।'

'বলছ কি, মেয়ের গায়ের গয়না?' শোভা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আমি কি প্রথমটা ধরতে পেরেছিলাম, না এমন একটা ব্যাপার ঘটবে বুঝতে পেরেছিলাম?' একটা চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ছোট্কা এদিক ওদিক তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল 'সারারাত তো ছটফট করল বুড়ো, একবার বাইরে যায়, একবার ঘরে ঢোকে, সকালে দেখি উঠোনের করমচা গাছটার গুঁড়ির কাছে ভূতের মতন চুপ করে বসে আছে। একেবার উঠল না। কোনো দিকে তাকাল না, না করল রান্নাবান্না—দাদা খালি পেটে অফিস করতে বেরিয়ে গেল।'

'তারপর?'

'আমার কেমন সন্দেহ হল, গয়না চুরি যাওয়া নিয়ে রাত্তিরে এত হৈচৈ লাফালাফি, দা নিয়ে ছোড়দিকে কাটতে যায়—কিন্তু তারপর হঠাৎ বুড়োর হল কি, এমন গুম মেরে গেল কেন, তারপর আজ সারাদিন করমচা গাছের নিচে মাটির দিকে চোখ রেখে বসে বসে কেবল ভাবছে কি—'

'যা খুশি ভাবুক।' শোভা রুষ্ট হয়ে উঠল। 'তুমি এই গয়নার বাক্সটা কোথায় পেলে, আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'বলছি শোন, দুপুরের দিকে আমারও শরীর বইছিল না—রাত্রে ঘুম নেই, সারাদিন খাওয়া নেই—একটা মাদুর টেনে ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছি, চোখ দুটো কিন্তু আমার ঠিক উঠোনের করমচা গাছের দিকে, বুড়ো কি করে দেখছিলাম।'

'তারপর?'

'দেখি এক সময় বাবা উঠে দাঁড়িয়েছে, ভেবেছে আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছি, একটুও নড়ছিলাম না তো, মরার মতন শুয়েছিলাম, আস্তে আস্তে দেখলাম বাবা যেখানে আমাদের কাঠঘুঁটে রাখা হয়, সেই ছোট চালাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটু পরে সেখান থেকে

বেরিয়ে এল, এসে আবার মিনিট দু'তিন করমচা তলায় দাঁড়াল, ঘরের দিকে অর্থাৎ আমি যেখানটায় শুয়ে আছি সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তক্ষুণি পা টিপে টিপে আবার সেই কাঠঘুঁটের ঘরটায় ঢুকল—'

'সেখানেই বুঝি গয়নার বাক্সটা ছিল ?'

'হুঁ, আমার সন্দেহটা তখন বেড়ে গেল। চালাটা থেকে বেরিয়ে এসে এবার আর বাবা সেখানে ঢুকল না, সোজা শোবার ঘরে ঢুকে আর একটা মাদুর টেনে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। সারাদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কত আর উঠোন-ঘর করবে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে আরম্ভ করল। আমিও সুযোগ বুঝে টুক করে ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠঘুঁটে রাখার জায়গাটায় গিয়ে ঢুকলাম। টেনে টেনে কাঠের আঁটিগুলো সরালাম, কিছু পেলাম না, ঘুঁটের ঢিপির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিতে হাতে কি একটা ঠেকল, টেনে বার করে দেখি ছোড়দির গয়নার বাক্স।'

'তা তুমি এটা এখানে নিয়ে এসেছ কেন ? যার গয়না তাকে ফিরিয়ে দাও।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে ছোট্‌কা জোরে মাথা ঝাঁকাল।

'না দেব না। আমাকে চোর বলেছে বাবা, এই অপমানের শোধ তুলব, তাছাড়া ছোড়দি পাগল, গয়না দিয়ে করবে কি ! আমার মাথার ভেতর কাল রাত থেকে আগুন জ্বলছে, আমি আর বাড়িতে থাকব না, এই গয়নার বাক্স সঙ্গে আছে, তোমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাব—আমাদের দু'জনের খাওয়া পরার ভাবনা থাকবে না, বেশ ক'দিন চলবে !'

'কি আহাম্মক তুমি, কি বোকা ছেলে, তোমার কথা শুনে আমার ঘেন্না করছে—দাও দিকিনি বাক্সটা !' শোভা ছোঁ মেরে চন্দনকাঠের বাক্সটা ছোট্‌কার হাত থেকে তুলে নিয়ে সোজা ছোট্‌কাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

'এই শোন !' চাপা গলায় ছোট্‌কা ডাকল। শোভা দাঁড়াল

না। পেছনে তাকাল না। ওর কালো চুলে একটা জোনাকি ঢুকেছে। ওটাকে সঙ্গে নিয়ে শোভা ছুটতে লাগল।

'এই ভাই শুনছ!' ডলির জানালায় দাঁড়িয়ে শোভা আস্তে ডাকল। ঘরের ভিতর আবছা অন্ধকার।

নিস্তরঙ্গ নদীর মতন সুন্দর শরীরটা মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে ডলি অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

'এই ভাই'—শোভা আবার ডাকল, জানলার গরাদে আঙুলের টুসকি মেরে ছোট একটা শব্দ করল। এবার ডলি জাগল। টগর ফুলের মতন বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। দেখলো ফুটফুটে একটি মেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে।

'কে ভাই তুমি?' শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে ডলি তখনি উঠে বসল।

'আমি ভেতরে ঢুকব।' শোভা বলল।

আশ্চর্য, পাগল মেয়ে দ্বিধা করল না, ইতস্তত করল না। দরজা খুলে দিল। 'এস ভাই!' যেন ছোট বোনকে আদর করে ডাকছে ও।

ভিতরে ঢুকল শোভা। চন্দন কাঠের বাক্সটা ডলির দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এই নাও ভাই তোমার গয়নাগাঁটি।'

'একি! তুমি এসব পেলে কোথায়।' পাগল এত খুশি হয়! তক্ষুণি বাক্সটা হাতে নিয়ে ডালাটা খুলে দেখল। 'এই তো আমার চন্দ্রহার, ডায়মণ্ড কাটা চুড়ি, দুল, আঙটি—সব ঠিক আছে দেখছি, হ্যাঁ ভাই সত্যি করে বল তো তুমি কোথায় এগুলো পেলে?' ঘনঘন শ্বাস ফেলছিল ডলি। শোভার চোখের দিকে তাকাল।

'তুমি যে সব জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে,' শোভা বোঝাল। 'আমি কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।'

'হি—হি।' ঝকঝকে ফরসা শরীরটা নাচিয়ে ডলি খিল খিল হাসল। 'কী চালাক মেয়ে তুমি—ভেবেছ ডলির মাথার ঠিক নেই, বদ্ধ পাগল, তাই আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ, কেমন না?'

শোভা থমকে গেল। কচি শামলা মুখটা শুকিয়ে গেল। এতটা ভাবেনি সে। ঝোঁকের মাথায় ছুটে এসেছে। যেন তার দাদা বিল্টুর কথাই ঠিক, আসলে এই মেয়ে পাগল নয়, এখন কি করে সে বলে কোথায় এই গয়না পেয়েছে, কে-ই বা চুরি করেছিল—এ যে বড়ো লজ্জার, ঘেন্নার কথা!

'বলো ভাই বলো!' শোভার থুতনি ছুঁয়ে ডলি আদর করল। 'সত্যি কথা বললে এই হার চুড়ি আঙটি দুল আমি তোমায় দিয়ে দেব, তোমার বিয়ের উপহার হবে।'

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে শোভা চোখে আঁচল চাপা দিল।

'এ কি তুমি কাঁদছ!' হাসতে গিয়ে ডলি হাসল না। মুখখানা করুণ করে ফেলল। 'আহা রে, কার দোষ ঢাকতে এই ভর সন্ধ্যেয় তুমি চোখের জল ফেলছ আমায় বলতো বোন, আমি তোমার দিদি, আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'বাবার দোষ ঢাকতে।' ঝড়ের বেগে ছোট্কা ঘরে ঢুকল। 'এ বাড়ির বুড়ো, যার মরতে আর বাকি নেই, নিজের মেয়ের গয়না চুরি করেছে, বুঝলে ছোড়দি, আমাদের পাষণ্ড বাপের কীর্তি, শোভা মুখ ফুটে বলে কি করে।'

'কি বলছিস তুই!' আর্তনাদের মতন গলার সুর করল ডলি। 'বাবা এমন কাজ কখনো করতে পারে! আমি কি এতই পাগল যে তোর কথা বিশ্বাস করব।'

'না মা তুই পাগল নস্, পাগল আমি—আমার মাথার ঠিক নেই, আমি গয়না চুরি করেছিলাম।' কেউ টের পায়নি, ছায়ার মতন নিঃশব্দে কখন হরলাল এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

'এ তুমি কি বলছ বাবা!' আশ্চর্য খসখসে গলায় ডলি বলল, 'তুমি না আমায় এত ভালবাসতে, কি করে আমি ভাবব যে তুমি এমন কাজ করলে?'

'আমি যে সারাক্ষণ ভয়ে মরছি ডলি, তোর দাদা অমূল্যকে দিয়ে

আর যেন ভরসা করতে পারছি না।' বুড়ো হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল।

'কেন হয়েছে কি ?'

'কদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে অমূল্য যেন কেমন ছটফট করছে, সরে যাবে সে এখান থেকে, যেন আয়নার মতন আমি তার মনের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি, সে এখন আলাদা ঘর চাইছে, একটি বউ চাইছে, ভাল খাওয়া-দাওয়া, নিরিবিলি সুখ—'

'তা না হয় চাইলই,' ছোট্কা ঝাঁজিয়ে উঠল। 'সারাজীবন দাদা আমাদের জন্য এত কষ্ট করেছে। তা বলে ছোড়দির গয়না চুরি করবে তুমি!'

'ভয়, ভাতের ভয়,' হরলালের কান্না থামছে না। 'এই বয়সে উপোস থাকব কেমন করে, তোর একটা পয়সা রোজগার করার ক্ষমতা নেই, এদিকে ডলি আছে, তিন তিনটে মুখের খোরাক চলত কি করে—'

'ওফ্, কী আক্কেল তোমার!' হতাশ বিষণ্ণ গলা ছোট্কার, যেন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। 'উপোস থাকবে ভয়ে মেয়ের গায়ের সোনা লুকিয়েছিলে—লোকে শুনলে মুখে থুথু ছিটোত যে।'

'থাক্ থাক্ খুব হয়েছে,' ডলি বলল, 'আর বকিস্‌নে বাবাকে, বুড়ো মানুষ শিশুর বাড়া। না গো বাবা!' এবার মেয়ে হরলালকে বোঝায়, সান্ত্বনা দেয়। 'অমূল্যকে দিয়ে তোমার সে সব ভয় নেই, বাড়ির বড় ছেলে, জোয়াল কাঁধে নিয়েছে, পালাবে কোথায় হি—হি।' বলতে বলতে ঘরের তিনটি মানুষকে অবাক করে দিয়ে ডলি ঝিলমিল করে হাসল। 'বরং ভাবনা শুরু হল তোমার আমাকে দিয়ে, আমি আবার বসন্তের স্বপ্ন দেখছি, বুঝেছ বাবা, নতুন করে আমার মনে ফুল ফুটছে—কই রে ভাই, দে চুড়ি ক'গাছা আমার হাতে পরিয়ে দে, অনেক দিন পর একটু সাজি।' ডলি শোভার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। শোভা স্তব্ধ বিমূঢ়। ফ্যাল ফ্যাল করে ছোট্কা

ছোড়দিকে দেখল। তবে কি সত্যি মেয়েটা পাগল। ভাবল সে। কেননা ডলি তখন মাথা দুলিয়ে গান ধরেছে : 'আয় রে বসন্ত, তোর কিরণ-মাখা পাখা মেলে···'

তখন একটা নির্জন পার্কে অমূল্য বসে আছে। দুরন্ত লোড-শেডিং চলছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারে 'কুলপি-মালাই' ডাক শুনে লোকটাকে ডেকে বেশ বড় সাইজের দুটো কুলপি কিনে অমূল্য তারিয়ে তারিয়ে খেল। বুকটা ঠাণ্ডা হল। গলার ভিতরটা এবং সবটা জিভ মিষ্টি আস্বাদে ভরে গেল। আর দেরি করল না সে। পয়সা নিয়ে কুলপিওয়ালা চলে গেছে। পকেট থেকে পুরিয়াটা বার করে অমূল্য চোখের সামনে তুলে ধরল। এত বড় একটা ডেলা কিনতে কত পয়সা গেল? হিসাব করতে গিয়ে মনে মনে সে হাসল। এই পয়সায় ছোট্‌কারা অনায়াসে তিনদিন মাছ খেতে পারত, অবশ্য তেলাপিয়া মাছ, ভাল মাছের অনেক দর। মাছ, বাবা, ডলি, ছোট্‌কা ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আফিমের ডেলাটা সে গলায় ছেড়ে দিল। তারপর টান হয়ে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস বইছে।

সমাপ্ত